প্রকাশক :
রাধানাথ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক
রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতি
১২, কালী দত্ত ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর ১৯৫৭

মুদ্রাকর :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

পরিবেশক :

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
ব্লক সি, রুম ৩
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

বিদ্যানুরাগী অগ্রজ

শ্রীযুক্ত বনবিহারী রায়

করকমলেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

বিদ্যাসাগর পরিচয়

কিংবদন্তীর আঙিনায়

প্রেমিক প্রেমিকা

বিচিত্র

সূচনা

ভারত-ইতিহাসের এক তমসাবৃত কালে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের বাইশে মে রামমোহনের জন্ম। মুসলমান শাসন তখন অস্তগামী, ব্রিটিশ বণিকেরা ভারতকে তখনো সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে নি। বিরাট দেশ জুড়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অরাজকতা ও নিবীর্যতা ছেয়েছিলো। পৌরাণিক ধারণার ঘূর্ণিপাকে আটকা-পড়া দেশবাসী ছিলো চিন্তা ও কর্মের জগতে চলৎশক্তিহীন পঙ্গু।

সেই আত্মিক তমসা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে এলেন রামমোহন। প্রত্যেক শক্তিধর যুগপ্রবর্তক পুরুষ জাতির অন্তরের অভাব দূর করতে ও জাতীয় সত্তার চাহিদা পূর্ণ করতে আসেন। রামমোহন শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলিকে কখনো উপেক্ষা করেন নি, শুধু সেই সিদ্ধান্তগুলিকে বিচার করে গ্রহণ করতে বলেছিলেন। নির্বিচার-গ্রহণ কিম্বা নির্বিচার-বর্জন এই দুই কুসংস্কার থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অতীতের বহু মনীষীর অভিজ্ঞতাগুলিকে তিনি পরম শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, কিন্তু সেগুলিকে বিচারের দ্বারা যাচাই করে নেবার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেছেন।

ভারতের আধুনিক যুগে যুক্তিবাদের প্রবর্তক হচ্ছেন রামমোহন। উপনিষদের ও বেদান্তের বাঙলা ও ইংরিজী অনুবাদ করে রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারত-মানসের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিগুলি স্বদেশবাসীর ও অন্য-দেশবাসীর সহজলভ্য করে দেন। এমার্সন, থোরো প্রভৃতি এ্যামেরিকান মনীষীরা রামমোহন-কৃত বেদান্ত ও উপনিষদের ইংরিজী অনুবাদ পড়ে ভারতবর্ষের মহোত্তম ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন।

রামমোহনই হচ্ছেন উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের প্রথম ও প্রকৃত সমন্বয়বাদী। হিন্দু, ইসলামীয় ও খৃষ্টান—এই তিন বিশ্বধর্ম সম্বন্ধে

তাঁর জ্ঞান ছিলো অতলস্পর্শী। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, ইংরিজী, গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু—এই সব ভাষায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। আরবী ভাষায় তিনি মূল কোরাণ শরিফ পড়েছিলেন। ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় তিনি বাইবল্ পড়েছিলেন। এই তিন বিশ্বধর্মের সমন্বয়-সাধন জ্ঞান ও বিচার বাদ দিয়ে শুধু বিচারহীন ভাবালুতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নি রামমোহন।

উপলব্ধির সঙ্গে মানব-প্রেমের যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিলো ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগের অবসানে, সেই অশুভ বিচ্ছেদ দূর করে, উপলব্ধি ও মানব-প্রেমের মধ্যে সেতু রচনা করলেন রামমোহন। দুর্গত মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের কাজে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন তিনি।

শিশু বালিকার বিবাহ, কন্যাবিক্রয়, সতীদাহ, পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারগুলির অবসান ঘটাবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিলো না। পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার যাতে স্বীকৃত হয় তার চেষ্টা তিনি করেছিলেন।

আমাদের শিক্ষা যাতে বিজ্ঞানমুখী হয় তার জন্য টোলের শিক্ষা-প্রণালীর জায়গায় বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন করবার জন্যে ইংরেজ শাসকদের টোলের শিক্ষা-পদ্ধতি চালু রাখবার কু-অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র সংগ্রাম করেন। সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ তিনি কখনো করেন নি। তিনি বেদান্তের চর্চার জন্য বেদান্ত কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙলা ভাষায় লিখিত প্রথম ব্যাকরণ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' তাঁরই সৃষ্টি। তার আগে যেসব ব্যাকরণ ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙলা ভাষা শেখানোর জন্যে রচিত হয়েছিলো সেগুলি সবই ইংরিজী ভাষায়। রামমোহনই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ধ্রুপদাঙ্গ গান রচনা করেন। বাংলা গদ্যের জনক তিনি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। হাটে চাষীদের কাছ থেকে তোলা নেওয়া অনুচিত বলে তিনি ঘোষণা

করেন। নুনের একচেটিয়া ব্যবসা ছিলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে। তাঁরই আন্দোলনের ফলে এই ব্যবস্থা রদ হয়। চাষীদের উপর জমিদারদের অত্যাচার সম্বন্ধে তিনি পার্লামেণ্টে আর্জি পেশ করেন ও চাষীদের খাজনা যাতে জমিদারেরা খুসিমত প্রতি বছর বাড়াতে না পারে তার জন্যে চাষীদের সঙ্গে জমিদারদের খাজনা সংক্রান্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব করেন।

Grand Juryতে ভারতীয়দের স্থান ছিলো না। প্রধানত রামমোহনের আন্দোলনের ফলে ভারতীয়রা সেই অধিকার লাভ করেন। মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তির মত প্রকাশের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে রামমোহন প্রেস-আইনের বিরুদ্ধে লড়েন। আমাদের জাতীয় জীবনের এমন একটি দিক ছিলো না যা রামমোহনের বিরাট মনীষার ও অতুলনীয় মানব-প্রেমের প্রসাদ-বঞ্চিত।

বিশ্বের প্রতিটি দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি রামমোহনের ছিলো প্রগাঢ় সহানুভূতি। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তিনি ছিলেন পূর্ণ সমর্থক। স্পেন, পোর্তুগাল, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলির স্বেচ্ছাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এইসব দেশে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করে লড়ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে, রামমোহন তাঁদের পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে 'ভারত-পথিক' অভিখ্যা দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি 'ভারত-পথিক', কিন্তু তাঁর সত্তার পরিধি আরো বিস্তৃত। বৌদ্ধ যুগের পরে রামমোহনই ভারতের প্রথম বিশ্ব-পথিক।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আন্তরকালেই এসেছেন রামমোহন। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন সেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কারো স্থান-সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়। তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন।'

—রবীন্দ্রনাথ

নিবেদন

ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে রামমোহনের আবির্ভাব। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায়, চিত্তদৈন্য ও কুসংস্কারে দেশ ছিল তখন আচ্ছন্ন। সেই যুগের প্রতিকূল পরিবেশ এবং সমাজের নিষ্করুণ বিরোধিতা সত্ত্বেও কেমন করে যে তিনি দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করলেন তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

ভারতের আধুনিক যুগের কথা বলতে হলে সবার আগেই বলতে হবে যুগ-প্রবর্তক রামমোহনের অবদানের কথা আর স্বীকার করতে হবে তাঁর কাছে আমাদের ঋণের কথা।

প্রতিভায় ও পাণ্ডিত্যে, চিন্তায় ও কর্মে, আদর্শে ও কর্মসাধনায় রামমোহন ছিলেন অনন্যসাধারণ পুরুষ। ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও উদার মানবিকতায় এবং জনকল্যাণের মহৎ আদর্শে ভাস্বর। তিনি চেয়েছিলেন সমাজকে গ্লানিমুক্ত করে নতুন সমাজ গঠন করতে, চেয়েছিলেন ধর্মের মধ্যে যা অকল্যাণকর তা দূর করে ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রীবন্ধন এবং একটি জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা যে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ করতে পারে সেই আদর্শের দিকেই সর্বপ্রথম রামমোহন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনিই বলেছেন, 'সমগ্র মানবজাতি একটি পরিবার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত মানবগোষ্ঠী এক মহাপরিবারের এক একটি শাখা মাত্র।'

রামমোহনের জীবন কীর্তিবহুল। তাঁর জীবনকথাই সাধারণ পাঠকের জন্য সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে।

'রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি' (স্থাপিত ১৯৫৭) এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছেন। সমিতির সভাপতি মনীষী শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন, নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং এই গ্রন্থের 'সূচনা' অধ্যায়টি লিখে রামমোহনের জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। মাননীয় বিচারপতি এস্. এ. মাসুদ, শ্রীঅমিত মজুমদার এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাধানাথ ঘোষ এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দিয়েছেন। সমিতির সকলেই রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার জন্য কাজ করে চলেছেন। এঁদের সকলকেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 'কিশোর কল্যাণ পরিষদে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাঁর সহৃদয় সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর পরিচালক শ্রীঅজিত কুমার সামই অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি মুদ্রণ করে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টাও আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছে।

রামমোহনের স্মৃতি-তর্পণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেদিন তিনি যে কামনা করেছিলেন, রামমোহনের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীতে আমরাও তাঁর কথা উদ্ধৃত করে সেই কামনাই করছি :

মৃত্যু অন্তরাল ভেদি' দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক্ উদ্বোধন, এনে দিক্ শক্তি অভিনব।

১৬-এ নিমতলা লেন
কলিকাতা-৬

রাসবিহারী রায়

সূচীপত্র

'আপনারা সকলেই জানেন, যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে-টুকু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আজ থেকে দুশো বছর আগের কথা। দেশে তখন বিরাজ করছে চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। মোঘল সাম্রাজ্যের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। বাংলার নবাবীসূর্য গেছে অস্তাচলে। সাত সমুদ্র তের নদী পারের ইংরেজদের হাতে চলে যাচ্ছে সোনার বাংলা। ঘটছে এক যুগের অবসান আর এক যুগের উদয়, এক রাজত্বের বিলুপ্তি, অন্য রাজত্বের অভ্যুদয়।

বর্গীদের আক্রমণ থেকে বাংলা মুক্ত হলেও আতংকের ছায়া তখনও বিলীন হয়নি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ক্ষয়ক্ষতির চিহ্নও গ্রাম বাংলা থেকে মুছে যায়নি। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য কোনো ক্ষেত্রেই আশার আলো নেই, নেই জীবনের গতিপ্রবাহ। এক নিদারুণ নির্জীবতা অধিকার করেছে মানুষের মনকে।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, 'যখন আমাদের আর্থিক মানসিক আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টি-শক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোন প্রশ্নের নতুন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্ত-দৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব'।

২২মে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ। ভারতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে এই দিন জন্মগ্রহণ করেন রামকান্ত রায়ের পুত্র রামমোহন।

রামমোহনের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের শাঁকসা গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঔরঙ্গজেবের

সময়ে নবাব সরকারের অধীনে কাজ করতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁর কর্মদক্ষতার জন্য 'রায় রায়ান' উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। এই বংশের কৌলিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকেই এই বংশে 'বন্দ্যোপাধ্যায়ের' পরিবর্তে 'রায়' উপাধি প্রচলিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রই শাঁকসা গ্রাম ত্যাগ করে রাধানগর গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করেন।

পশ্চিম বাঙলার প্রসিদ্ধ স্থান খানাকুল-কৃষ্ণনগর। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এই অঞ্চল ছিল সেকালে খুবই উন্নত। সংস্কৃত-চর্চার জন্য এ অঞ্চলের খ্যাতি ছিল প্রচুর। সেকালে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সামাজিক মর্যাদাও ছিল খুব বেশি। বাঙলার বহু বরেণ্য সন্তান জন্মগ্রহন করেছেন এখানে। রাধানগর এই অঞ্চলেরই একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। কৃষ্ণচন্দ্র যখন এখানে আসেন তখন রাধানগর ছিল বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই সব কারণেই মুর্শিদাবাদের আদি নিবাস ত্যাগ করে কৃষ্ণচন্দ্র আসেন রাধানগরে। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র—হরিপ্রসাদ, অমরচন্দ্র ও ব্রজবিনোদ। ব্রজবিনোদ মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার অধীনে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি। নবাব সরকারের কাছ থেকে সদ্ব্যবহার না পেয়ে তিনি চাকরি ত্যাগ করেন। এর পর গ্রামে এসে জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতেই অতিবাহিত করেন।

ব্রজবিনোদের সাত পুত্র। রামকান্ত তাঁর পঞ্চম সন্তান। পূর্ব-পুরুষদের মতো ইনিও নবাব সরকারের চাকরী করতেন। কোনো কারণে আত্মসম্মান হানি হবার আশঙ্কায় ইনি চাকরি ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ থেকে চলে আসেন। পরে বর্ধমান রাজার কাছ থেকে কয়েকটি গ্রামের ইজারা নিয়ে বিষয় সম্পত্তির কাজে মন দেন। কিন্তু বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের সঙ্গে রামকান্তের বিরোধ বাধে নানা কারণে। এর পর তিনি বিষয়কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৭৯১ সালের কাছাকাছি রামকান্ত লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে এক নতুন বাড়ি করে বাস করেন এবং ১৭৯৬ সালে এক দানপত্র করে বিষয়-সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন। রামকান্তের মৃত্যু হয় বর্ধমানে ১৮০৩ সালে।

রামকান্তের তিন স্ত্রীর মধ্যে তারিণী দেবী ছিলেন খব নিষ্ঠাবতী ও তেজস্বিনী। রায় পরিবারের সকলেই তাঁকে 'ফুলঠাকুরাণী' বলেই ডাকতেন। তারিণী দেবীর দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র জগমোহন ও রামমোহন। মায়ের অনেক গুণই রামমোহন পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে।

এক ইংরেজ বন্ধুকে লেখা চিঠিতে রামমোহন তাঁর পূর্বপুরুষদের এইরূপ পরিচয় দিয়েছেন ঃ

"আমার পূর্বপুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক-ধর্ম সম্বন্ধীয় কর্তব্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় এক শত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ্দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে, কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, কখনও বা পতন ; কখন ধনী, কখন নির্ধন ; কখন সফলতালাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্মানুসারে ধর্মযাজক ব্যবসায়ী ; এবং উক্ত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবারের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীস্থ অপর কেহই ছিলেন না।"

বাল্যকালের শিক্ষা

সেকালের রীতি অনুসারে রামমোহনের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় গ্রামের পাঠশালাতেই। ফার্সী ছিল সেকালের রাজভাষা। রাজদরবারে ও সরকারী কাজকর্মে এর ছিল প্রচুর সমাদর। বাল্যে মৌলভীর কাছেই তিনি ফার্সী শিক্ষা করেন, শিক্ষা করেন আরবী ভাষাও। রামমোহন তাঁর বাল্যশিক্ষার কথা নিজেই বলেছেন ঃ

"আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি ফার্সী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান রাজসরকারে কার্য করিতে হইলে উক্ত দুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্মশাস্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত।"

রামমোহনের পিতার আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল, বিষয়বুদ্ধিতেও তাঁর বিচক্ষণতা কম ছিল না। খুবই স্বাভাবিক যে তিনি তাঁর মেধাবী পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাই করেছিলেন। রামমোহনের বয়স যখন ন'বছর তখন ভাল করে আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করবার জন্য তাঁকে তিনি পাঠিয়ে দেন পাটনায়। দু'তিন বছর কাটে তাঁর পাটনায়, কাটে জ্ঞান অর্জনে। এখানেই তিনি আরবী ভাষাতে ইউক্লিড্ ও অ্যারিস্টটলের রচনাগুলি পাঠ করেন। মৌলভীর কাছে মন দিয়ে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানও পাঠ করেন। পাটনাতেই তিনি সুফীদের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি হাফেজ, জালালুদ্দীন রুমী প্রভৃতির কবিতা উদ্ধৃত করতেন তাঁর রচনা ও আলোচনার মধ্যে।

পাটনার শিক্ষালাভ রামমোহনের জীবনে সার্থক হয়েছিল।

এখানে তিনি যে শুধু আরবী ও ফার্সী ভাষাই শিখেছিলেন তা নয় তিনি পাঠও করেছিলেন নানা প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ। এর ফলে তাঁর বিচার বিশ্লেষণ করবার শক্তি বেড়ে যায় এবং চিত্তে আসে উদারতা।

বারাণসীকে তো বলা হয় ভারতের অক্সফোর্ড। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতচর্চার পীঠস্থান। সেকালে এর খ্যাতি ছিল বহু বিস্তৃত। পাটনার পর এই কাশীধামেই এলেন রামমোহন সংস্কৃত শিক্ষা করতে, হিন্দুশাস্ত্রের নানা গ্রন্থ পাঠ করতে। তাঁর প্রতিভা ও অনুসন্ধিৎসা ছিল অসাধারণ, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বেদ বেদান্ত ও অন্য সব শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতে সমর্থ হন।

পাটনা ও কাশীতে শিক্ষালাভ করে রামমোহন বাড়ি ফিরলেন। তাঁর মাতাপিতা আশা করেছিলেন রামমোহন পূর্বপুরুষদের ধর্মমতেই বিশ্বাসী হবেন ও নিষ্ঠাবান হিন্দুর মত আচার অনুষ্ঠান পালন করবেন। কিন্তু তাঁদের সে আশা পূর্ণ হল না। রামমোহন ফিরলেন প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের বিরোধী হয়ে। তাঁর মানসলোকে তখন দেখা দিয়েছে বিচিত্র চিন্তার প্রবাহ। তখন তিনি হয়ে গেছেন যুক্তিবাদী রামমোহন।

এই সময়ে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সমাজ ও ধর্ম নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলে। এতে পারিবারিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। লোকাচারের বিরুদ্ধে, প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে রামমোহন অকাট্য যুক্তি উপস্থিত করেন, কিছুতেই পিতার মত গ্রহণ করতে চান না। রামমোহনের ধর্মমত ও সমাজচিন্তা রামকান্তকে বিচলিত করে, ব্যথিত করে।

তারিণী দেবী ছিলেন নিষ্ঠাবতী মহিলা। দিন কাটত তাঁর পূজা অর্চনায় আর আচার অনুষ্ঠান পালন করে। তিনি মনে করলেন তাঁর পুত্র কুলাঙ্গার হয়ে গিয়েছে, বিধর্মী হয়েছে। কাজেই রাধানগরের বাড়িতে তাঁর স্থান নেই। একথাই একদিন তিনি জানিয়ে দিলেন রামমোহনকে।

এর পর মাতাপিতার সঙ্গে রামমোহনের বিচ্ছেদ ঘটল। স্বাধীনচেতা রামমোহন তখন গৃহত্যাগ করলেন। তাঁর বয়স তখন ষোল বছর মাত্র।

কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি ?

রামমোহনের আত্মকথা থেকেই একটু অংশ উদ্ধৃত করি : "ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম…"।

ডাঃ কার্পেণ্টার লিখেছেন তিনি রামমোহনের কাছ থেকে শুনেছিলেন, দু'তিন বছরের জন্য তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন। ১৮০৩-৪ সালে প্রকাশিত তুহ-ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীনে রামমোহন বলেছেন, "আমি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্বত্য ও সমতল-ভূমিতে পর্যটন করিয়াছি।"

চাকরি জীবনের কথা

পিতার মৃত্যুর পর জীবিকার সন্ধানে রামমোহন গেলেন মুর্শিদাবাদে। কালেক্টর উডফোর্ডের অধীনে এখানে কিছু সময় কাজও করলেন। এখান থেকেই ১৮০৩ সালে প্রকাশ করলেন 'তুহ্‌-ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদিন'। গ্রন্থটি ফার্সিতে লেখা, ভূমিকাটি লেখা আরবীতে। রামমোহনের ধর্মমত ব্যক্ত হয়েছে এই রচনায়। একেশ্বরবাদ যে যুক্তিসঙ্গত তাই তিনি এখানে বিশ্লেষণ করেছেন।

রামমোহনের সঙ্গে অনেক ইংরেজেরই তো পরিচয় ছিল। এঁদের মধ্যে কালেক্টর জন ডিগ্‌বি সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন রামমোহনের হিতৈষী বন্ধু। ডিগ্‌বীর কাছেই তিনি ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর এবং রংপুরে কাজ করেন। কখন তিনি ফৌজদারী আদালতের সেরিস্তাদার, কখন দেওয়ান, আবার কখনও বা ডিগ্‌বীর মুন্সী হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

চাকরি জীবনে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা বা আত্মসম্মান বোধ কখনও হারান নি। এই প্রতিভাধর পুরুষের কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে ডিগ্‌বী সাহেব মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইংরেজীতে যে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পেরেছিলেন তা সম্ভব হয় তাঁরই সংস্পর্শে এসে। ডিগ্‌বী লিখেছেন, "আমি যখন রামমোহনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলাম, তিনি তখন ইংরেজী ভাষায় কোনো প্রকারে কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। শুদ্ধভাবে লিখিতে পারিতেন না। দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পর বিশেষ মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত সরকারী চিঠিপত্রাদি পাঠ করিয়া, ইংরেজদের সহিত আলাপাদি করিয়া এত সুন্দর সেই ভাষা শিখিয়াছিলেন যে শুদ্ধরূপে লিখিতে ও

ভালরূপে বলিতে পারিতেন। তিনি সর্বদা ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িতেন ও ইউরোপীয় রাজনীতির সমস্ত খবর রাখিতেন।"

রামমোহনের ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন একাধিক ইংরেজ। তাঁর বিশুদ্ধ ইংরেজী রচনা ও আলাপ আলোচনায় নির্ভুল ইংরেজী বাক্যের ব্যবহার সেকালের অনেক মনীষীকেই বিমুগ্ধ করেছিল। ইংরেজী শিক্ষালাভ করেন তিনি অনেক দেরীতে এবং নিজের চেষ্টাতেই। রামমোহনের সমকালে তাঁর মত এত ভাল ইংরেজী কোন বাঙালীই লিখতে বা বলতে পারেন নি।

শুধু সরকারী চাকরী করে আর অর্থ উপার্জন করেই যে রংপুরে রামমোহনের সময় কাটত তা নয়। তাঁর রংপুরের বাসায় বসত আলোচনা সভা আর মিলিত হতেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। জৈন ধর্মালম্বীরাও যোগ দিতেন আলোচনায়। জৈনধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য তিনি 'কল্পসূত্র'ও পাঠ করেছিলেন এই সময়। এই আসরে রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রকাশ করতেন এবং আলোচনা করতেন বেদান্তের সার কথা, একেশ্বরবাদ।

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ছিলেন তান্ত্রিক। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁর ছিল গভীর ব্যুৎপত্তি। এই পণ্ডিতের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে রংপুরে। এ যেন মনিকাঞ্চন যোগ। উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধন। রামমোহন তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। মুগ্ধ হতেন তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মীতায়। হরিহরানন্দেরই ভাই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহনের ব্রহ্ম সভায় যোগ দেন।

ডিগ্‌বী সাহেবের বিলাত যাত্রার পর রংপুর থেকে রামমোহন ফিরলেন দেশে। এবার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু রামমোহনের বিরোধীরা সৃষ্টি করল গণ্ডগোলের। বিবাহের কাজ অবশ্য সম্পন্ন হল কিন্তু এরা তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতে ছাড়ল না।

এই সময় রাধানগরের কাছে বাস করত এক দাঙ্গাবাজ ব্রাহ্মণ। তার দলে ছিল শ'পাঁচেক লোক যারা তার কথা মত কাজ করত। এই সব লোকই তার নির্দেশে ভোর বেলায় রামমোহনের বাড়িতে গরুর হাড় ছুঁড়ত এবং মুরগীর ডাক ডাকত। সব অত্যাচার কিন্তু রামমোহন নীরবেই সহ্য করতেন। রামমোহনের চরিত্রে সহনশীলতা ছিল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

রামমোহনের ভাগ্যে শান্তি ছিল না। এতদিন পরে বাড়ি ফিরলেন, কোথায় পাবেন মায়ের সস্নেহ ব্যবহার ও গ্রামবাসীদের অভ্যর্থনা, তার পরিবর্তে পেলেন ধিক্কার ও বিরোধিতা। এবারও তারিণী দেবী তাঁকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, তাঁর বাড়িতে রামমোহনের স্থান হবে না, পুত্রের মুখদর্শন করবেন না তিনি।

তথাস্তু বলেই সেদিন রামমোহন বেরিয়ে এলেন তাঁর পৈত্রিক ভদ্রাসন থেকে দুই পত্নী ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে। এলেন রাধানগরের কাছেই লাঙ্গুলপাড়ায় বাস করতে। কিন্তু এ স্থান তো ছিল তাঁর মায়ের জমিদারীর মধ্যে। কাজেই এখানে বাস করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না তিনি। তাই এখান থেকে কিছু দূরে রঘুনাথপুর গ্রামে এক শ্মশানভূমির উপর বাড়ি তৈরি করে কিছুদিন বাস করতে লাগলেন।

এই বাড়ির সামনেই এক ষড়ভূজ মঞ্চ তৈরী করালেন। এর চার পাশে খোদাই করা হল 'ওঁ তৎসৎ', 'একমেবাদ্বিতীয়ং'। কথিত আছে কলকাতা থেকে রঘুনাথপুর এলেই এই মঞ্চ প্রদক্ষিণ করতে ভুলতেন না এবং গ্রামের এই বাড়িতে এলেই ব্রহ্মের উপাসনায় দীর্ঘ সময় কাটাতেন তিনি।

আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা

রামমোহনের চাকরি জীবন শেষ হল ১৮১৪ সালে। নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং অর্থ সঞ্চয় করে তিনি এলেন কলকাতায়। এই মহানগরীতেই তিনি বাস করেন প্রায় যোল বছর, ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত। তাঁর কর্মবহুল জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশই কাটে এই শহরে। কি বিশাল বিপুল কর্মসাধনার মধ্যে কেটেছিল এই ক'টি বছর তা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বিরোধ, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ তাঁকে নানাভাবে বিব্রত করেছে, তাঁর প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করেছে, কিন্তু তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। গভীর আত্মপ্রত্যয় ও অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি যা সত্য বলে মনে করেছেন তাই প্রচার করেছেন। যা অকল্যাণকর মনে করেছেন তারই বিরুদ্ধে তিনি তীব্র সংগ্রাম করেছেন।

মানিকতলার যে বাড়িতে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন তা তের হাজার টাকায় ক্রয় করেন ফ্রান্সিস্ মেণ্ডেস্ নামে এক সাহেবের কাছ থেকে। এই ঐতিহাসিক বাড়িতেই বসেছে অনেক আসর, মিলিত হয়েছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান ও জৈন ধর্মাবলম্বী অসংখ্য লোক। এখানে এসেছেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্টর জাকমঁ, ইংরেজ মহিলা ফ্যানি পার্কস্, এসেছেন আরও অনেক সম্ভ্রান্ত বিদেশী। এখান থেকেই রামমোহন প্রচার করেছেন একেশ্বরবাদ, সংগ্রাম করেছেন কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ জানিয়েছেন অকল্যাণকর চিন্তা ও কর্মের বিরুদ্ধে। এখান থেকেই শুনিয়েছেন তিনি জাতির নবজাগরণের তূর্যধ্বনি।

রামমোহনের সংগ্রামী জীবন সুরু হয় মহানগরী কলকাতায়। প্রথমেই তিনি স্থাপন করেন একটি মিলন-কেন্দ্র যেখানে ধর্ম সমাজ

সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনার আসর বসবে নিয়মিতভাবে। এই উদ্দেশ্যেই ১৮১৫ সালে তাঁর মানিকতলার বাড়িতেই স্থাপন করেন 'আত্মীয় সভা'। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য বেদ বেদান্ত-চর্চা হলেও সে যুগের নানা জরুরী সমস্যাও আলোচিত হত এখানে। 'আত্মীয়-সভা'কেই আমরা বাংলার প্রথম আধুনিক সমিতি বলতে পারি, কেন না এর পূর্বে বাংলায় এই ধরনের কোন সভা বা সমিতি স্থাপিত হয় নি। এখান থেকেই রামমোহনের ধর্মমতের কথা ও তাঁর ধর্মসংস্কারের পরিকল্পনা প্রচারিত হয়েছিল। আত্মীয়সভা ছিল তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মত প্রকাশের মাধ্যম।

আত্মীয়সভার অধিবেশন বসত সপ্তাহে একদিন। বেদ পাঠ করতেন শিবপ্রসাদ মিশ্র, ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন গোবিন্দ মালা। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দিতেন এই সভায়। রামমোহনের বন্ধু ডেভিড হেয়ার ১৮১৬ সালের এক অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। যাঁরা নিয়মিত সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন তাঁদের মধ্যে সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তি—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, কালীনাথ মুন্সী, মথুরানাথ মল্লিক এবং প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুরও মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। তারানাথ চক্রবর্তী ছিলেন রামমোহনের প্রিয় পাত্র। রামমোহনেরই চেষ্টায় তিনি 'ক্যালকাটা জার্নালে' অনুবাদকের কাজ পান এবং পরে রামমোহনই তাঁকে ম্যাকিণ্টশ কোম্পানীর অফিসে একটি চাকরি যোগাড় করে দেন।

বড়বাজারের বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে আত্মীয়সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয় ১৮১৯ সালে। এই সভায় বিখ্যাত মাদ্রাজী পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী রামমোহনকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। সভায় যোগ দিলেন শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, যোগ দিলেন হিন্দু সমাজের দলপতি রাজা রাধাকান্ত দেব। সভায় প্রবেশ করলেন এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। উন্নত ললাট, চোখে প্রতিভার

দীপ্তি, নিঃশঙ্কচিত্ত, স্থিতধী। ইনিই সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী, রামমোহন।

সুরু হল বিচার বিতর্ক। শাস্ত্রী বললেন, শূদ্রের বেদপাঠ করা নিষিদ্ধ। বেদপাঠ করলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। শূদ্রদের ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানের কোন অধিকার নেই। আর যে সকল ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করেন না তাঁরা অব্রাহ্মণ, তাঁরা ব্রাত্য। যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠান না করলে ব্রহ্মজ্ঞান হতে পাবে না। রামমোহন এর উত্তর দেন শাস্ত্র থেকেই। তিনি বলেন, বর্ণাশ্রম ধর্মপালন করা ভালই, কিন্তু তা পালন না করতে পারলে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতেই পারে না তা ঠিক নয়। মৈত্রেয়ীর মতো নারীরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মপালন না করেই।

এমনি অনেক প্রশ্ন নিয়েই তর্কবিতর্ক হয়েছিল সেদিন। রামমোহনের গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন কলকাতার বহু ব্যক্তি। শেষে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী রামমোহনের যুক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। এই প্রসিদ্ধ বিচারের কথা ছাপা হয়েছিল সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলা ভাষায়।

রামমোহনের যেমন অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল তেমনি ছিল ঘোর শত্রুও। শত্রুরা আত্মীয় সভার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে দেয়। ছড়াতে থাকে কুৎসা ও অপবাদ। এমন কি কেউ কেউ প্রচার করে, রামমোহনের এই সভায় গোবৎস হত্যা করা হয়। রামমোহনের কয়েকজন দুর্বলচিত্ত বন্ধুও এই সভার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

এতো বিরোধিতা সত্ত্বেও রামমোহন কিন্তু বিচলিত হননি, সভার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এই সময়ে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয় মামলা মকদ্দমায়, বিব্রত হতে হয় বিষয় সম্পত্তি নিয়ে। এতে আত্মীয়সভার জীবন স্তিমিত হয়ে আসে। কিছুকাল পরে এর বিলুপ্তি ঘটে।

হিন্দুশাস্ত্র প্রচার

বেদ বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুদের পরম পবিত্র শাস্ত্র। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। বেদান্ত বেদের শিরোভূষণ। উপনিষদ বা বেদান্ত যুগে যুগে মানুষের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটিয়েছে, মর্ত্যের মানুষকে সন্ধান দিয়েছে অমৃতের।

রামমোহনের সময়ে বেদান্তের চর্চা বাংলাদেশ থেকে প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিতেরা এই অমূল্য সম্পদের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। অনেকেই বেদান্ত অনুশীলন করতেন না, ছাত্রদেরও শিক্ষা দিতেন না। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়ে, খানাকুল প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতেরা রীতিমত সংস্কৃতচর্চা করতেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই বেদ উপনিষদের চর্চা করতেন। জনসাধারণ এসব ধর্মগ্রন্থ থেকে কোনো পাথেয় সংগ্রহ করবার সুযোগ পেত না।

রামমোহনই প্রথম তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বেদান্তের দিকে। তিনিই বেদান্তের বহুল প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সার সংগ্রহ করে, ভাষ্য ও ভূমিকা সংযোজন করে সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে বেদান্তকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করেন। এর জন্য তিনি কি বিপুল পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করেছিলেন তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়।

কলকাতায় আসার পরই তিনি যে কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন তা হচ্ছে বেদান্তের প্রচার। প্রথমে প্রকাশ করেন 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ। হিন্দী ও ইংরেজী ভাষাতেও এর অনুবাদ প্রকাশ করেন তিনি। এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' ও 'অনুষ্ঠান' খুবই মূল্যবান। ভূমিকায় রামমোহন বলেন,

পরমেশ্বরের স্বরূপ না জানা গেলেও এবং তিনি বাক্য ও মনের অগোচর হলেও তাঁর উপাসনাই বিধেয়। তিনিই জগতের স্রষ্টা, তিনিই সর্বশক্তিমান। তাঁর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

রামমোহন বেদান্তসূত্রের অনুবাদ আরম্ভ করলে গোঁড়া পণ্ডিতেরা বিক্ষুব্ধ হন। তাঁরা আপত্তি জানান, বেদ বেদান্তের অনুবাদ করাও যেমন পাপ, শোনাও তেমনি পাপ ; শূদ্ররা শুনলে পাতক হয়। এর উত্তরে রামমোহন বলেন—শ্রুতি, স্মৃতি, গীতা, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ তো অধ্যাপকেরা ছাত্রদের পড়ান এবং তাঁরা ব্যাখ্যাও শোনেন। এতে কি পাপ হয় না ?

রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের মধ্যে যা সত্য, যা শাশ্বত তাই প্রচার করা। তারই সারকথা তিনি দেশবাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে য়ুরোপীয়দের বোঝাতে চেয়েছিলেন, হিন্দুধর্মের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে সকল কুসংস্কার বা অবাঞ্ছিত আচার অনুষ্ঠান প্রবেশ করেছে তার সঙ্গে প্রকৃত হিন্দুধর্মের কোন সম্পর্কই নেই। হিন্দুশাস্ত্রে একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনাই স্বীকৃত।

'বেদান্ত গ্রন্থে'র পর রামমোহন প্রকাশ করলেন 'বেদান্তসার'। প্রকাশ কাল ১৮১৬। এর হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়। এটি সাধারণ পাঠকের বোঝার জন্য ২২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। আকারে ক্ষুদ্র হলেও বেদান্তের সারকথা এই গ্রন্থে বিধৃত আছে।

এ দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেই রামমোহন তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। এর পর জনসাধারণের মধ্যে উপনিষদের বাণী প্রচার করবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। ১৮১৬ থেকে ১৮১৯-এর মধ্যে একের পর এক তিনি পাঁচখানি উপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন—কেনোপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ।

এই সব গ্রন্থ প্রকাশ করে রামমোহন চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের

শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনার এক নতুন দিগন্তের। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজ সেদিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেনি। তাঁর ধর্মমত বিক্ষোভ ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ক্রমে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। পণ্ডিতেরা রামমোহনকে অভিযুক্ত করেন। তাঁরা বলেন, যে সব ধর্মগ্রন্থ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরাই স্পর্শ করবার অধিকারী, রামমোহন তাদের মুদ্রিত করে তুলে দিলেন অব্রাহ্মণদের হাতে। আচণ্ডাল সকলের হাতেই তুলে দিলেন হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ। এ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাঁরা ভাবলেন রামমোহন আরও অনেক অনিষ্ট সাধন করতে পারেন। কোথায় যে তিনি গিয়ে থামবেন তার ঠিক নেই। সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখেই তাঁরা সেদিন দেখেছিলেন রামমোহনকে।

যাঁরা গোঁড়া হিন্দু, যাঁরা পুরোহিত তাঁরা আতঙ্কিত হলেন এবং রামমোহনের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করতে লাগলেন। বিবাহ-বাসরে, শ্রাদ্ধ-সভায়, ধনীদের বৈঠকখানায় রামমোহনের মুণ্ডপাত চলতে লাগল। বিক্ষোভ-তরঙ্গ যখন তাঁর চারদিকে আছড়ে পড়ছে তখন কিন্তু তিনি প্রশান্তচিত্তে অবিচলিতভাবেই কাজ করে চলেছেন।

পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার

শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কে রামামোহন যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। পাদ্রীব দল ও পণ্ডিতেরা তাঁকে বারবার আক্রমণ করেছে কিন্তু ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে তাদের মত তিনি খণ্ডন করেছেন। এর জন্য তাঁকে পাঠ করতে হয়েছে অনেক গ্রন্থ, মন্থন করতে হয়েছে শাস্ত্র-সমুদ্র। শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে, ব্যাখ্যা করে ও জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিপক্ষের আক্রমণ তিনি প্রতিহত করেছেন। মসীযুদ্ধে রামমোহন ছিলেন অদ্বিতীয়।

তাঁর সহনশীলতাও ছিল অসামান্য। কেউ তাঁকে ইতর ভাষায় গালি দিয়েছে, কেউ বা তাঁর উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করেছে, কিন্তু তিনি কখনও তাঁর স্বভাবসুলভ স্থৈর্য হারান নি। তিনি তীর নিক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু সে তীরে ছিল না কোন বিষ।

রামমোহন তাঁর শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবকে একসময় বলেছিলেন, তর্ক-বির্তকের সময় প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে শ্রদ্ধা করা উচিত। রামমোহনের চরিত্রের এই উদারতার পরিচয় পাই একাধিক পণ্ডিতের সংগে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর বিচার বিতর্কের সময়ে।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের কথা। মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট কলেজের শিক্ষক শংকর শাস্ত্রী ইংরেজী সংবাদপত্রে এক চিঠি প্রকাশ করে রামমোহনের ধর্মমতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি ছিলেন মূর্তিপূজার সমর্থক, রামমোহন ছিলেন তার বিরোধী। রামমোহন ছিলেন একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক, শাস্ত্রী ছিলেন তার বিপরীত। শাস্ত্রী বললেন, সকল মনুষ্য সমাজেই প্রতিমূর্তি পূজার ব্যবস্থা আছে। রামমোহন বললেন, এ ধারণা ভুল। যারা নিরাকার পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা করতে অক্ষম কেবলমাত্র তাদের জন্যই মূর্তি পূজার ব্যবস্থা,

বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে মূর্তিপূজা প্রচলিত নেই। তিনি শাস্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, "তুরস্ক এবং আরব দেশবাসী উচ্চতম শ্রেণী হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত মুসলমানগণ, ইউরোপের প্রটেষ্টেন্ট খ্রীষ্টানগণ এবং কবির ও নানকের অনেক শিষ্য মূর্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পূজা কি করেন না?" শংকর শাস্ত্রীর চিঠির উত্তর দেন রামমোহন ইংরাজীতেই। উত্তর দেন, 'A Defence of Hinduism' পুস্তিকা প্রকাশ করে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ছিলেন সে যুগের বিদগ্ধ ব্যক্তি। হিন্দুশাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও রেখে গেছেন তিনি স্মরণীয় কীর্তি। রামমোহনের ধর্মমতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে এবং প্রতিমা-পূজা সমর্থন করে তিনি ১৮১৭ সালে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের এই গ্রন্থের উত্তরে রামমোহন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' প্রকাশ করেন। উভয়ের গ্রন্থই বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত হয়। রামমোহনের মূল বক্তব্য ছিল—হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

এই বই পড়ে মৃত্যুঞ্জয় এতই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন যে সকল শিষ্টতা ও শালীনতা বিসর্জন দিয়ে রামমোহনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং কটূক্তি ও বিদ্রূপ বর্ষণ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। এ সম্পর্কে রামমোহনের নিজের কথাই উদ্ধৃত করি:

"আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যংগ বিদ্রূপ দুর্বাক্য ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ও দুর্বাক্য কথন সর্বদা অযুক্তা হয়; দ্বিতীয় আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই। অতএব ভট্টাচার্যের দুর্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।"

এর পর এক চৈতন্যভক্ত গোস্বামী রামমোহনের বিরুদ্ধে এক পুস্তিকা প্রচার করেন। গোস্বামী বলেন, "তোমাদের যদি কোন

বেদান্ত ভাষা অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমত জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান"। ১৮১৮ সালে রামমোহন গোস্বামীর মত খণ্ডন করে 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

এমনিভাবেই রামমোহনকে একের পর এক বিচার বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়। চারদিক থেকে প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে থাকেন পণ্ডিতেরা। রামমোহনও মসীযুদ্ধে বীরের মত লড়াই করে চলেন।

এরপর এক কবিতাকারের উদয় হয়। তিনি অভিযোগ করেন, রামমোহন বেদের অর্থ গোপন করেছেন, তিনি বিষ্ণু ও ব্যাসাদি ঋষিদের অবমাননা করেন এবং নিজে ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করে গর্ব করে থাকেন।

রামমোহন কবিতাকারের উক্তি খণ্ডন করে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রকাশ কাল ১৮২০ খৃষ্টাব্দ। রামমোহন কবিতাকারকে উপদেশ দেন, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, নশ্বর ও নামরূপ বিশিষ্ট পদার্থে ঈশ্বর জ্ঞান না করে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করাই বিধেয়।

এক উদ্ভট অভিযোগও করেন কবিতাকার। তিনি বলেন, রামমোহনের ধর্মমত প্রকাশ হওয়ার ফলে দেশে অমংগল, মারী ভয়, ও মন্বন্তর দেখা দিয়েছে।

এর উত্তরে রামমোহন তাঁকে প্রশ্ন করেন, "লোকের মংগল কিংবা অমংগল আপন আপন কর্মাধীন। ব্রহ্ম বিষয়ক পুস্তক প্রকাশের বহু পূর্বে কবিতাকারের রোগ ও মিথ্যা অপবাদের জন্য ধনহানি ও মানহানি হয়। সে বিষয়েও কি কবিতাকার বলিবেন যে, উহা তাঁহার স্বকর্মের ফল নহে, কোন ব্যক্তি কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার রোগ হইয়াছে?"

বড়বাজারে বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে রামমোহনের যে শাস্ত্রবিচার হয়েছিল তা পূর্বে 'আত্মীয়সভা'

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এই বিতর্ক সভায় রামমোহন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে শোচনীয়ভাবেই পরাস্ত করেন।

এবার আসরে নামলেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। "ধর্মসংস্থাপন-কারী" নাম গ্রহণ করে রামমোহনকে 'চারটি প্রশ্ন' করলেন। রামমোহন এর উত্তর দিলেন "চারি প্রশ্নের উত্তর" পুস্তিকা প্রকাশ করে। এর প্রকাশ কাল ১৮২২ খৃষ্টাব্দ।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন আর এক কাণ্ড করে বসলেন 'পাষণ্ড পীড়ন' নামে ২৩৮ পৃষ্ঠার এক গ্রন্থ রচনা করে। রামমোহনের মতবাদের বিরোধী ছিলেন নন্দলাল ঠাকুর। তাঁরই নির্দেশে কাশীনাথ এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে রামমোহনের বিরুদ্ধে অজস্র কটুবাক্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। 'পাষণ্ড', 'ভণ্ড তত্ত্বজ্ঞানী' প্রভৃতি ভাষায় তাঁকে গালিগালাজ করেছিলেন কাশীনাথ।

বিচার বিতর্কে রামমোহনকে কেউই ধরাশায়ী করতে পারেনি। প্রতিপক্ষের সকল আক্রমণ তিনি ব্যর্থ করেছেন। কাজেই তর্ক-পঞ্চাননও রেহাই পেলেন না। রামমোহন তাঁর এই বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে লেখনী ধারণ করলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন ২৬১ পৃষ্ঠার এক গ্রন্থ। এর নাম দিলেন 'পথ্য প্রদান'। এটি 'পাষণ্ডপীড়নে'রই উত্তর।

পাদরীদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে রামমোহনের যেমন অসাধারণ জ্ঞান ছিল তেমনি খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল গভীর। বাইবেলের মূল গ্রন্থ পাঠ করার জন্য তিনি গ্রীক্ ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। মুসলমান ধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরানও তিনি পাঠ করেছিলেন সযত্নে।

তিনি নানা শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন বটে, কিন্তু বিচার বিশ্লেষণ না করে বা অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোনো ধর্মমতই গ্রহণ বা বর্জন করেন নি। স্বাধীনভাবেই তিনি মতামত প্রকাশ করেছেন। অপ্রিয় হলেও যা সত্য, যা যুক্তিগ্রাহ্য বলে তাঁর ধারণা হয়েছে তা অকপটে নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করে গেছেন। খৃষ্টধর্মের মধ্যে তিনি যেমন সন্ধান পেয়েছিলেন যীশুখ্রীষ্টের কল্যাণবাণীর, তেমনি লক্ষ্য করেছিলেন অনেক যুক্তিহীন তত্ত্বকথা এবং অনেক কাল্পনিক কাহিনী।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের কথা। রামমোহন প্রকাশ করলেন এক গ্রন্থ—'Precepts of Jesus—guide to peace and happiness' অর্থাৎ যীশুর উপদেশ—শান্তি ও সুখের সহায়ক। এই ৮৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে রামমোহনের মৌলিক চিন্তার ও প্রখর যুক্তির স্বাক্ষর আছে। এতে আছে খৃষ্টধর্মের মূল্যায়ণ।

কলকাতা ও শ্রীরামপুরের পাদরীরা কিন্তু বইটি পড়ে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা ভাবলেন, কি সর্বনাশ! একজন অ-খৃষ্টান এমন সব বাজে কথা লিখেছেন, নস্যাৎ করেছেন খৃষ্টধর্মের মূল্যবান তত্ত্বকথা!

খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করতেন যীশুর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন ত্রিত্ববাদে (trinity)। অর্থাৎ তাঁদের কাছে যীশু ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরের পুত্র, ও পাপীদের আশ্রয়স্থল। যীশুর উপদেশ বা বাণীগুলির উপর রামমোহনের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি স্বীকার

করতেন এদের মূল্য, মানুষের জীবনে এদের কল্যাণকর প্রভাব। কিন্তু পাদরীরা যীশুকে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতেন তা তিনি সমর্থন করেন নি। তাঁর অভিযোগ, খৃষ্টানেরা যীশুর চরিত্রকে রহস্যাবৃত করে ফেলেছেন। এমন সব অলৌকিক কাহিনী, কিংবদন্তি ও কাল্পনিক ঘটনা তাঁর জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছেন যা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিচার করলে অসঙ্গত বলেই মনে হবে।

রামমোহনের এই কঠোর সমালোচনায় পাদরীরা বিচলিত হলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন রামমোহন তো হিন্দুধর্মের উপর আস্থা হারিয়েছেন, আধা-খৃষ্টান হয়েই গেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করতে পারেন এই আশাই তাঁরা পোষণ করতেন। কিন্তু গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁদের সে ভুল ভেঙে গেল। রামমোহনকে তাঁরা বন্ধুর বদলে এখন থেকে শত্রু বলেই গণ্য করলেন।

শ্রীরামপুরের মিশনারী ডাঃ মার্শম্যান 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় রামমোহনকে আক্রমণ করলেন। তিনি লিখলেন, রামমোহন পৌত্তলিক, বিধর্মী ইত্যাদি। খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে তিনি একেবারেই অর্বাচীন। তিনি বিশ্বের ত্রাণকর্তাকে সর্বসাধারণের কাছে হেয় করেছেন।

মার্শম্যানের সমালোচনার উত্তর দিলেন রামমোহন। "এ ফ্রেণ্ড টু ট্রুথ" বা 'সত্যের বন্ধু' এই নামেই প্রকাশ করলেন 'An Appeal to Christian Public' বা 'খৃষ্টীয় জনসাধারণের কাছে নিবেদন'। এর প্রকাশকাল ১৮২০ খৃষ্টাব্দ। এই পুস্তিকায় রামমোহন গুরুতর অভিযোগ করেন, "ঈশ্বরের ত্রিত্ব, খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও তাঁর রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি মতবাদ বাইবেল গ্রন্থেই নেই। মিশনারীরা বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝেন না, না বুঝেই এই প্রকার বিশ্বাস করেন।"

রামমোহন লিখলেন আর একখানা গ্রন্থ—The Second Appeal to the Christian Public, খৃষ্টীয় জনসাধারণের প্রতি

তাঁর দ্বিতীয় নিবেদন। এটি ১৭০ পৃষ্ঠার বই। এর উত্তরে 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা তাঁদের এক সাপ্তাহিক সংখ্যায় (জুন ১৮২১) ১৭৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা প্রকাশ করে। সমালোচনার শেষে তাঁরা রামমোহনকে নতুন করে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে ও বিতর্কের বিষয়গুলি পুনরায় বিবেচনা করতে অনুরোধ করেন।

মেরী কারপেন্টার কিন্তু রামমোহনের এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রামমোহনের প্রখর যুক্তি, খৃষ্টধর্মে গভীর জ্ঞান এবং তা নির্ভুলভাবে সমালোচনা করার ক্ষমতা, তাঁর অনুসন্ধানের ব্যাপকতা, প্রাঞ্জল ভাষায় মত প্রকাশ এবং প্রতিপক্ষকে পরাজিত করবার নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মার্শম্যান কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলেন না। আবার আক্রমণ করলেন। রামমোহন তৃতীয় পুস্তক রচনা করে তাঁর জবাব দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধক দেখা দিল এই সময়ে। এতদিন রামমোহনের গ্রন্থ ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসেই মুদ্রিত হত। কিন্তু রামমোহন খৃষ্টধর্মবিরোধী বলে এই প্রেস তাঁর এই বই ছাপতে রাজী হল না। দেখা দিল সঙ্কট।

রামমোহন কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করতেন না। তিনি নিজেই ধর্মতলায় 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' নামে এক ছাপাখানা স্থাপন করলেন। ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে এখান থেকেই তাঁর Final Appeal—'শেষ নিবেদন' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৭৯।

এবার মার্শম্যান সাহেব নিরুত্তর হলেন। রামমোহনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এই বিচার বিতর্ক সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র ইংরেজ সম্পাদক লিখলেন, 'এই বিচারে এটাই প্রতিপন্ন হল যে বর্তমান সময়ে এ দেশে রামমোহনের সমকক্ষ আর কেউ নেই।' রামমোহনের এই ধর্মবিচারের গ্রন্থগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার পাঠকেরাও পড়বার সুযোগ পেয়েছিল।

আর একটি ঘটনা। ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এলেন উইলিয়ম অ্যাডাম্। এলেন শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনে যোগদান করতে। কলকাতায় পৌঁছে রামমোহনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন। কেরি সাহেবের বাইবেলের অনুবাদে কিছু ভুল ছিল। ইয়েটস্, অ্যাডাম্ ও রামমোহন বাইবেলের সঠিক অনুবাদের কাজে হাত দেন। অনুবাদ করবার সময় রামমোহনের মতের সঙ্গে ইয়েটসের মতের মিল হল না, তাই তিনি অনুবাদের কাজ ছেড়ে দিলেন। অ্যাডাম্ কিন্তু রামমোহনের সঙ্গ ছাড়লেন না। তিনি ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান ছিলেন কিন্তু রামমোহনের সংস্পর্শে এসে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। তিনি হয়ে যান একেশ্বরবাদী। কাজেই তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনের সংসর্গ ত্যাগ করেন। এ হচ্ছে ১৮২১ সালের কথা।

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা অ্যাডামকে হারিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা মনে করলেন অ্যাডামের এই মত পরিবর্তনের ফলে সাধারণের কাছে খৃষ্টধর্ম হেয় হয়ে গেল। কলকাতার খৃষ্টানেরা অ্যাডামকে 'second fallen Adam' বলে বিদ্রুপ করতে লাগল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা তাঁদের ইংরেজী 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' এবং বাংলা 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় রামমোহনকে আক্রমণ করল।

১৮২১ সালের জুলাই মাসের কথা। হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এক রচনা প্রকাশিত হল। রচনাটি জঘন্য। রামমোহন এর উত্তর দিলেন তাঁর 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকায়। ভারতের খৃষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাসে লেখাটি মূল্যবান। কি পদ্ধতিতে পাদরীরা সেকালে ধর্মপ্রচার করতেন, কেমন করে তাঁরা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করতেন এখানে তারই বিশ্লেষণ করেছেন রামমোহন। বাঙালীদের মধ্যে রামমোহনই প্রথম খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। পরে অবশ্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও খৃষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

রামমোহনের এই মূল্যবান রচনাটি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন ত্রিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যীশুখিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিশনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার

উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্মমত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা দুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সে দুর্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্মান্তিক কোন মতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্বপ্রকারে অনৈকতার মূল হয়।"

পাদরীদের সঙ্গে রামমোহনের সংঘর্ষকে নিছক মসী যুদ্ধ বা তর্কের খাতিরে তর্ক বলে গণ্য করলে ভুল করা হবে। জনকল্যাণের স্বার্থেই রামমোহন লেখনী ধারণ করেন। সত্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আদর্শ, মিথ্যা ও অন্যায়ের মুখোশ খুলে দেওয়াই তিনি কর্তব্য বলে মনে করতেন। পাদরীদের সঙ্গে বাদানুবাদ করে এবং তাঁদের ধর্মপ্রচারের কৌশলের কথা প্রচার করে তিনি হিন্দু সমাজের কল্যাণসাধন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

"কি সংকটের সময়েই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দু সমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্বে মাঝখানে এসে দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খ্রীষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।"

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার

রামমোহন ছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের পথিকৃৎ। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী। তাঁর দূরদৃষ্টিও ছিল অভ্রান্ত। যে শিক্ষা যুগ ও জীবনের কোন সমস্যা সমাধান করতে পারে না সে শিক্ষার কোন মূল্যই ছিল না তাঁর কাছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে দিগন্তের আলো, জাতীয় জীবনে আসবে নব জাগরণ। জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হলে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার যে একান্ত প্রয়োজন তা রামমোহনই সে যুগে সব চেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছিলেন।

কলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য কোন মহাবিদ্যালয় স্থাপিত না করে জেনারেল কমিটি অব্ পাব্লিক ইন্স্ট্রাক্শন্ যখন সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করবার ব্যবস্থা করে তখন রামমোহনের মত স্বাধীনচেতা বিদ্যানুরাগীর পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। গভর্নমেণ্টের এই কাজকে তিনি অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলেই মনে করলেন। সেদিন জীবন ও জীবিকার জন্য বাঙালীর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পুরনো ধাঁচের একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাক্ষেত্রে যে দেশের কোনো মঙ্গল সাধন করা যাবে না তা রামমোহনই সকলের আগে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

১১ই ডিসেম্বর, ১৮২৩।

এইদিন এক দীর্ঘ পত্র লিখে তিনি ভারতের বড়লাট লর্ড আমহার্স্টের কাছে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেন। শিক্ষার ইতিহাসে এই চিঠিটি মূল্যবান দলিল হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

সেকালের এই অসাধারণ মনীষীর শিক্ষা সম্পর্কে যুক্তি ও চিন্তা যে কত সারগর্ভ ও আধুনিক ছিল এতে তার স্মরণীয় স্বাক্ষর আছে। সুন্দর ইংরেজী ভাষায় লেখা এই চিঠিতে রামমোহন বলেন, সংস্কৃত শিক্ষা তো ভারতে বহুকাল থেকেই চলে আসছে। গভর্নমেণ্ট অর্থ-ব্যয় করে যে প্রকার সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছেন এ যুগে তার কোনো প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত ভাষা সুকঠিন এবং একে আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য। এই ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে জীবনব্যাপী অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে এ ভাষা কার্যকরী নয়। এমন কি, ব্যাকরণের জটিল সূত্র এবং বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতির তত্ত্বকথা যে পদ্ধতিতে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয় তা ছাত্রদের মনকে অযথা ভারাক্রান্ত করেই তোলে। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীরই বিরোধিতা করেছিলেন রামমোহন। রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে পরামর্শ দেন, এ দেশে অজ্ঞতা দূর করে শিক্ষা বিস্তার করা যদি ইংরেজদের লক্ষ্য হয় তাহলে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান দেশবাসীরা যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই উচিত। এ দেশে শিক্ষার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকাতেই ইউরোপীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি ক্রয় করা যেতে পারে।

রামমোহন সংস্কৃতচর্চার বিরোধী একেবারেই ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম বেদ উপনিষদের চর্চা প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হন। বেদ শিক্ষা দেবার জন্য ১৮২৬ সালে মানিকতলা স্ট্রীটে তিনি নিজেই একটি বেদ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। এখানে সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হত। তিনি চেয়েছিলেন দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার, চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার। এই চিঠিতেই তিনি অধ্যাপকদের বৃত্তি দেওয়ার সুপারিশ

করেন। তিনি বলেন "সংস্কৃত ভাষায় অধিকতর নিষ্ঠাপূর্ণ চর্চা যদি অভিপ্রেত হয়ে থাকে, তাহলে সে ইচ্ছা সফল করা যায়, সব চাইতে যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপকদের কিছু বৃত্তি বা বেতনদানের ব্যবস্থা করে। তাঁরা আত্মপ্রেরণা থেকেই এই ভাষা অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হয়েছেন। এইভাবে পুরস্কৃত হলে তাঁদের কর্মোদ্যম আরো বৃদ্ধি পাবে।"

রামমোহনের এই ঐতিহাসিক সুপারিশ গভর্নমেণ্ট সেদিন উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিল, শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতি কি হওয়া উচিত তা নির্ধারিত করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। এই সময় থেকেই প্রায় দশ বছর প্রাচ্যবিদ্ ও পাশ্চাত্যবিদদের মধ্যে বিতর্ক চলে। এক দল প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের পক্ষপাতী, অন্য দল ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিদ্যার সমর্থক। এই মত-পার্থক্যের অবসান ঘটে ১৮৩৫ সালে মেকলে যখন তাঁর মিনিট বা মন্তব্যলিপিতে শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজী ভাষা গ্রহণের পক্ষে নানা যুক্তি প্রদর্শন করেন। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করে সরকারী নীতি ঘোষণা করেন। এর পর থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। লর্ড আমহার্স্টকে রামমোহন যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা পরে ফলপ্রসূ হয়।

যাঁরা প্রকৃত শিক্ষাব্রতী দেশের কল্যাণের জন্য তাঁরা নিস্বার্থ-ভাবেই কাজ করে থাকেন। অন্য কেউ যখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উদ্যোগী হন তখন তাঁকে সক্রিয় সহযোগিতাও করেন। রামমোহনকে আমরা শিক্ষাব্রতীর এই ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখি। আলেকজাণ্ডার ডাফ্ সাহেবের কথাই বলি। এই খৃষ্টান মিশনারী এলেন কলকাতায় ১৮৩০ সালে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয় স্থাপন ও খৃষ্টধর্ম প্রচার। কলকাতায় পৌঁছেই তিনি প্রথমে মহানগরীর দিক্‌পাল রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। ইংরেজী শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে চান, এ কথাই তিনি

জানান তাঁকে। ডাফ্ সাহেবের অভিপ্রায় জেনে রামমোহন খুশী হন এবং সকল প্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন। কোনো হিন্দুই তখন খৃষ্টান মিশনারীকে স্কুল স্থাপনের জন্য বাড়ি ভাড়া দিতে রাজী ছিল না। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের একাংশ ডাফ্ সাহেবের স্কুলের জন্য ছেড়ে দেন এবং পরে চিৎপুর রোডে কমল বসুর বাড়িটি চল্লিশ টাকায় ভাড়া স্থির করে দেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ছাত্র সংগ্রহের ব্যাপারে। হিন্দুরা প্রথমে তাদের ছেলেদের খৃষ্টানদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পাঠাতে রাজী হয় না। রামমোহন নিজেই এই বিদ্যালয়ের জন্য কয়েকজন ছাত্র সংগ্রহ করে দেন, এবং প্রায় একমাস ধরে বিদ্যালয়ে গিয়ে তাদের পড়াশুনা লক্ষ্য করেন।

ডাফ্ সাহেবের স্কুলে প্রতিদিন বাইবেল পাঠ হত। এতে অবশ্য রামমোহনের কোন আপত্তি ছিল না, কেন না তিনি মনে করতেন বাইবেল পাঠ করলে ছাত্রদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই। ডাফ্ সাহেবের স্কুলে প্রথম যেদিন ছাত্রদের বাইবেল পাঠ করতে বলা হয় সেদিন তারা আপত্তি জানায়, বাইবেল পড়তে রাজী হয় না। রামমোহন তাদের বুঝিয়ে বলেন ঃ

"বাইবেল পড়লেই খৃষ্টান হয় না। আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ খৃষ্টান হই নাই, কোরান পাঠ করিয়াছি কিন্তু মুসলমান হই নাই। আবার হোরেশ উইলসন্ সাহেব হিন্দু-শাস্ত্র পড়িয়াছেন কিন্তু হিন্দু হন নাই। বিচার-পূর্বক সত্য গ্রহণ করিবে। কেহ তোমাদিগকে বলপূর্বক খৃষ্টান করিতে পারিবে না।"

রামমোহনের এই উপদেশ শুনে ছাত্ররা আর আপত্তি করেনি। সেদিনের এই শিশু বিদ্যালয়ই আজকের সুবিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজ। ডাফ্ সাহেব রামমোহনের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। উইলিয়ম্ কেরির ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন ইউস্টেস্ কেরি। একটি বিদ্যালয় স্থাপন করবার জন্য তাঁর প্রয়োজন হয় কিছু জমির। রামমোহন তাঁকে একখণ্ড জমি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। ঐ দিন মাত্র কুড়ি জন ছাত্র নিয়ে চিৎপুর রোডের উপর গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে (যে স্থানে এখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারী অবস্থিত) হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্নমেণ্ট কোন সাহায্য দেয় নি। দেশের বিদ্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই অগ্রণী হয়ে স্থাপন করেন এই ঐতিহাসিক শিক্ষাকেন্দ্র।

এই সময় রামমোহন স্থায়ীভাবেই বাস করছিলেন কলকাতায়। দেশী-বিদেশী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল। ডেভিড হেয়ার ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের তিনিও ছিলেন অনুরাগী। রামমোহনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি জানা ছিল শহরবাসীদের। কাজেই তাঁর মত বিদ্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সংরক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতাদের কাছে সেদিন রামমোহন ছিলেন চক্ষুশূল। তাঁর ধর্মমত ও সমাজচিন্তার তাঁরা ছিলেন ঘোর বিরোধী। রামমোহন যখন জানতে পারলেন এঁরা তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করতে রাজী নন তখন তিনি স্বেচ্ছায় কলেজের সংশ্রব ত্যাগ করেন। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু কলেজ স্থাপিত হোক, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার লাভ করুক। তিনি ছিলেন না কোন পদমর্যাদা বা কর্তৃত্বের প্রত্যাশী। তাই সেদিন নিঃশব্দে তিনি সরে এসেছিলেন এই প্রচেষ্টা থেকে। এই প্রসঙ্গে যোগেশ বাগল বলেন, "হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা যে প্রথম হইতেই রামমোহন জানিতেন এবং ইহার প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সার্থক সমর্থন ছিল ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কলেজের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিলে হিন্দু প্রধানগণের আপত্তি হেতু ইহার প্রতিষ্ঠারই বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এইরূপ আশংকা করিয়া তিনি ইহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।" রামমোহনের চরিত্রের এই উদারতা লক্ষ্যণীয়।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালেই রামমোহন নিজেই এক

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের সকল ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন এবং এর জন্য তাঁকে স্বার্থত্যাগও করতে হয় প্রচুর। বিদ্যালয়টি ছিল অবৈতনিক। ভাল ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য তিনি এক ইংরেজকে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথমে সিমলার সুঁড়িপাড়ায় এই বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হয়। পরে ১৯২২ সালে হেদুয়ার কাছে নতুন বাড়িতে এই স্কুল স্থানান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয় তখন অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে অভিহিত হয়। রামমোহনের এই স্কুল অচিরেই ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ এই বিদ্যালয়েই শিক্ষা গ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এখানে শিক্ষালাভ করেন। রামমোহন নিজেই তাঁকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে গাড়ি করে এনে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।

এই বিদ্যালয়ের এক প্রকাশ্য পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হয় 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকার ১৮১৮ সালের ১০ই জানুয়ারীর সংখ্যায়। সেদিন ৫০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হয়। ইংরেজী পাঠ, বানান, ব্যাকরণ, অনুবাদ পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা, বলবিদ্যা, ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল। এই রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়, রামমোহন তাঁর এই স্কুলে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে চরিত্র গঠনের দিকেও লক্ষ্য রাখা হত। ধর্ম ও নীতিশিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার ইতিহাসে রামমোহনের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলটির দান অকিঞ্চিৎকর নয়।

আজ পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো শত ধারায় প্রবেশ করেছে আমাদের দেশে। আমাদের সাহিত্য সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা সকল ক্ষেত্রকেই প্রভাবান্বিত করেছে। আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সুফল লাভ করেছি অনেক। এই শিক্ষাই প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন রামমোহন।

সমাজ সংস্কার ও নারী-কল্যাণ

সমাজ তখন জীর্ণ, অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন। দীর্ঘকাল ধরে লোকাচারের নাগপাশে আবদ্ধ। একে গ্লানি-মুক্ত করবার সাহস সেদিন ছিল না কারুর। এই দুর্দিনেই রামমোহনের আবির্ভাব। তিনিই যুগজীর্ণ সমাজকে সংস্কার করতে প্রথম উদ্যোগী হন।

সবচেয়ে যে জঘন্য সামাজিক অবিচার তাঁর মনকে বিক্ষুব্ধ ও বেদনাতুর করে তুলেছিল তা সতীদাহ প্রথা। এই প্রথা নিবারণ করবার জন্য তাঁর ভাবনা চিন্তা প্রয়াসের অন্ত ছিল না।

একটি ঘটনার কথা বলছি এখানে। এ হচ্ছে ১৮১২ সালের কথা।

অলকমঞ্জরী ছিলেন রামমোহনের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ। কথিত আছে, তিনি সহমৃতা হন। অলকমঞ্জরীর বয়স তখন চল্লিশ বছর। মৃতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে লাঙ্গুলপাড়ায় নদীর তীরে একটি স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপিত হয়। রামমোহন হয়ত তখন ছিলেন অন্য কোথাও, হয়ত বা ছিলেন লাঙ্গুলপাড়ায়। এই ঘটনাই তাঁকে স্তম্ভিত ও মর্মাহত করে। এর পর থেকেই তিনি সংকল্প করেন এই নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদ সাধন করবেন দেশ থেকে।

রামমোহনের সময়ে সতীদাহ প্রথা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৮২১ সালের একটি সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, কেবলমাত্র কলকাতা বিভাগের মধ্যেই ১৮১৫ সালে ২৫৩, ১৮১৬ সালে ২৮৯, ১৮১৭ সালে ৪৪২ এবং ১৮১৮ সালে ৫৪৪ জন নারী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছে। বাংলার শহরে গ্রামে গঞ্জে গঙ্গার তীরে তীরে সহস্রশীর্ষ চিতাগ্নি জ্বলে উঠেছে। ধর্মের নামে চলেছে নারীমেধ।

অতীতে সহমরণ প্রথা রহিত করবার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। মোঘল সম্রাট আকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন, চেষ্টাও

করেছিলেন বন্ধ করতে তাঁর সাম্রাজ্যে। পেশওয়া বাজীরাও তাঁর রাজ্য থেকে সহমরণ বন্ধ করবার চেষ্টা করেন। এমনি বিক্ষিপ্তভাবেই চলেছিল চেষ্টা। খৃষ্টান মিশনারীরাও এই জঘন্য প্রথাকে সুনজরে দেখতেন না। কোন কোন স্থানে জেলার শাসকেরা বিশেষ ক্ষেত্রে সতীদাহ করবার অনুমতি দিতেও অস্বীকার করতেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় ১৭৮৭ সালে সাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট একটি ক্ষেত্রে সতীদাহ করবার অনুমতি দেন নি। লর্ড ওয়েলেসলিও সহমরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি এ বিষয়ে নিজামত আদালতের পণ্ডিতদের মতও সংগ্রহ করেন। পণ্ডিতেরা অবশ্য সেদিন সতীদাহ প্রথা রদ করবার কোন সুপারিশ করেন নি। তাঁরা বলেছিলেন কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা মাদক দ্রব্য খাইয়ে জোর করে চিতারোহণ করতে বাধ্য করা উচিত নয় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সহমরণ শাস্ত্রসম্মত নয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অভিমত ছিল সহমরণ শাস্ত্রসম্মত নয়। হেষ্টিংসও সতীদাহের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম ও সমাজের উপর হস্তক্ষেপ করতে তিনি সাহসী ছিলেন না।

ইংলণ্ডেও এই প্রথার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জনমত গঠিত হচ্ছিল। সভা সমিতিতে আলোচনাও চলেছিল। নারীদের জোর করে পুড়িয়ে মারা বন্ধ করবার জন্য কিছু কিছু আইন-কানুনও যে লিপিবদ্ধ না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু তা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে তখন সতীদাহের সমর্থন করত হিন্দু সমাজের এক বিরাট অংশ। তারা মনে করত প্রথাটা শাস্ত্রসম্মত ও দেশাচার সমর্থিত এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করা মহাপাপ। তারাই গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করেছিল সহমরণ প্রথা রহিত না করতে।

এই সময়ই রামমোহন অবতীর্ণ হলেন সমাজ-সংস্কারে, দীর্ঘদিনের একটি অভিশপ্ত সামাজিক প্রথার মূলচ্ছেদ করতে।

সমাজ সংস্কারের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে হস্তক্ষেপ করতে হলে

প্রথমেই জনমত গঠন করা উচিত। জনমত গঠন করতে হলে চাই প্রচার। এই প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম সংবাদপত্র ও পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ। রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করবার জন্য জনমত গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের শেষে প্রকাশ করেন 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'। ১৮১৯ সালে প্রকাশ করেন 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'। বিদেশীয়দের জন্য ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়। বহুল প্রচারের জন্য রামমোহন পুস্তিকাগুলি বিনামূল্যেই বিতরণ করেন। ১৮২৯ সালে তিনি "সহমরণ বিষয়" নামে আর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এইসব গ্রন্থে সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত হয়েছে।

রামমোহনের বক্তব্য যুক্তিসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, শাস্ত্রের বিধান মতে সহমরণ অবশ্য কর্তব্য নয়। শাস্ত্রে এ বিষয়ে কোন নির্দেশ নেই। সহমরণ অপেক্ষা স্বামীহারা নারীদের ব্রহ্মচর্য পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। রামমোহন অভিযোগ করেন, নারীদের উপর বলপ্রয়োগ করা হয়, তাদের বাধ্য করা হয় চিতারোহণ করতে। এ এক অমানুষিক অত্যাচার, এ হচ্ছে নারী-হত্যা। তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও সংকল্প করতে দেওয়া হয় না। দেশ থেকে এই পৈশাচিক প্রথা উঠিয়ে দিতেই তিনি বদ্ধপরিকর হন।

রামমোহনের বিরোধী পক্ষেরা বলেন, সহমরণ প্রচলিত দেশাচার, দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এ প্রথা। সহমরণে কোন দোষই নেই। রামমোহন উত্তর দেন, দীর্ঘকাল কোন প্রথা দেশে প্রচলিত থাকলেই যে তা কল্যাণকর হবে একথা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই যুক্তি মেনে নিলে নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি যা চিরকাল চলে আসছে তাও নির্দোষ বলে গণ্য হবে। অবলা নারীকে স্বর্গের লোভ দেখিয়ে বলপূর্বক দাহ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এ হচ্ছে মহাপাপ, দেশাচারের নামে এরূপভাবে স্ত্রী বধ কখনই পুণ্যকর্ম বলে গণ্য হতে পারে না।

নারীজাতির প্রতি রামমোহনের ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। অন্তরের এই মহান ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ" পুস্তিকায়। স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি অল্প, তারা অস্থিরচিত্ত, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাদের ধর্মভাবও অল্প, এইরূপ নানা অভিযোগ ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন রামমোহন। তিনি বলেন ঃ

"তোমরা বল, স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, অনুরাগ ও ধর্মজ্ঞানশূন্য হয়। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে পাইয়াছেন যে, বিনা কারণে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন না ! তবে তাহারা বুদ্ধিমতী কিনা ইহা কিরূপে নির্ণয় করেন ?"

রামমোহন আরও বলেন, "তাহাদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি। কারণ যে দেশের লোক মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, সেই দেশের স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয় ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন। তত্রাচ কহেন যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।"

নারীদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গে রামমোহন বলেন, "এ দোষ পুরুষে অধিক, কি স্ত্রীতে অধিক, উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবে। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিত হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারিত হইয়াছে। আমরা অনুভব করিতে পারিব, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ বেশী হইবে। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ স্বীকার করি যে, আপনাদের ন্যায় অন্যকে সরল মনে করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করেন।"

নারীদের সহিষ্ণুতা ও ধর্মভাব সম্বন্ধে রামমোহন বলেন, "দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ অপমান, তিরস্কার, যাতনা তাহারা কেবল

ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন।”

প্রায় দেড়শো বছর আগে নারী-জাতির সম্মান অধিকার ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সমাজের অনেকেই যখন চিন্তা করেন নি তখন রামমোহন দুর্জয় সংকল্প নিয়ে নারীজাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন।

উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। রামমোহন রায়ের আন্দোলন তাঁকে উৎসাহিত করল। একদিন হৃদ্য পরিবেশে তাঁর সঙ্গে আলোচনাও করলেন। সতীদাহের মত অভিশপ্ত প্রথা যে অবিলম্বে রহিত করা উচিত তা রামমোহন নানা যুক্তির সাহায্যে বড়লাটকে বুঝিয়ে দিলেন। রামমোহন মনে করতেন আইনের সাহায্য না নিয়ে পুলিসের সহায়তায় এ প্রথা সহজেই উচ্ছেদ করা যেতে পারে। এতে লোকের মনে কোন আশঙ্কা থাকবে না, কেউ ভাববে না গভর্নমেণ্ট তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছে। রামমোহন তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ককে কিন্তু তিনি আইনের সাহায্য নিয়েই সহমরণ প্রথা রদ করেন।

৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। এই তারিখেই লর্ড বেন্টিঙ্ক আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন। দীর্ঘকালের একটি জাতীয় কলঙ্ক মোচন করেন। রামমোহনের সেদিন কি আনন্দ! পরে রামমোহন ও তাঁর সমর্থকেরা কলকাতার টাউন হলে বেন্টিঙ্ককে সম্বর্ধিত করেন।

সেদিন ছিল ১৬ই জানুয়ারী, ১৮৩০ সাল। কলকাতার ৩০০ জন অধিবাসীর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয় এক অভিনন্দনপত্র। ইংরেজী অভিনন্দন পত্রটি কালীনাথ রায় এবং বাংলা অভিনন্দন পত্রটি হরিহর দত্ত পাঠ করেন। এর যথাযোগ্য উত্তর দেন লর্ড বেন্টিঙ্ক।

কিন্তু সংরক্ষণশীল হিন্দু সমাজে দেখা দেয় প্রচণ্ড বিক্ষোভ। গোঁড়া হিন্দুরা মুখর হয়ে উঠে প্রতিবাদে নিন্দায় কুৎসায়। হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল, ঘোর কলি এল, রামমোহন নিপাত যাক্ প্রভৃতি ধ্বনি উঠল তাদের কণ্ঠে, এমন কি রামমোহনের জীবননাশ করবার চেষ্টাও চলতে থাকে। হিতৈষী বন্ধুরা রামমোহনকে সতর্ক হয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে অনুবোধ করেন। কিন্তু রামমোহন নির্ভীক চিত্তেই তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম করে চলেন।

সংরক্ষণশীল সংবাদপত্রেও চলে রামমোহনের মুণ্ডপাত। 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১২ই ডিসেম্বর) স্পষ্টই বলে, রামমোহনই সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রধান সমর্থক। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভুল পথে চালিত হয়েছেন। রামমোহনের হিন্দু পরিবারে জন্ম হতে পারে, কিন্তু তিনি হিন্দুসমাজের নেতা নন। তিনি হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। কাজেই তিনি সকল হিন্দুর মত সমথন করতে পারেন না।

হিন্দুসমাজের নেতারা এই আইনের বিরুদ্ধে একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লাগেন। আইন রদ করবার জন্য এক আবেদনপত্র পাঠান বড়লাটের কাছে। এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন কলকাতার ৬৫২ জন অধিবাসী এবং এর সঙ্গেই সংযুক্ত হয়েছিল ১২০ জন পণ্ডিতের অভিমত। আর একটি আবেদনপত্রও পাঠান হয়, এতে স্বাক্ষর করেন কলকাতার বাইরের ৬৪৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং এর সঙ্গেও যুক্ত ছিল ২৮ জন পণ্ডিতের অভিমত। এ ছাড়া ১৮৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারী রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখ বিশিষ্ট

ব্যক্তিরা বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের অভিমত জ্ঞাপন করে আসেন।

১৭ই জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজ ভবনে তাঁরা এক সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় স্থির হয়, তাঁরা পার্লামেণ্টের কাছে এই আইন রদ করবার জন্য আপীল করবেন। এ ছাড়া এই সভায় সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় যে, যে সকল হিন্দু দেশাচারের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের সমাজচ্যুত করা হবে, তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।

রাধাকান্ত দেবকে সভাপতি করে সতীদাহ প্রথা রদ আইনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার জন্যে ধর্মসভা স্থাপিত হয়। এই সভার পক্ষ থেকে বিলাতে এক আপীল পাঠান হয়। রামমোহন রায়ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি বিলাতে যাবার সময় বহু হিন্দুর স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্রও পার্লামেণ্টে পেশ করবার জন্য সঙ্গে নিয়ে যান।

আড়াই বছর পরের ঘটনা। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই। প্রিভি কাউন্সিলের এক অধিবেশনে সহমরণ সমর্থকদের আবেদন অগ্রাহ্য করে সতীদাহ নিষেধক আইন বলবৎ করা হয়। নারী-কল্যাণব্রতী রামমোহনের চেষ্টা সার্থক হয়। বাংলা তথা ভারতের বুক থেকে দীর্ঘদিনের এক অভিশাপ চিরতরে দূরীভূত হয়। নানা কুসংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ নিগৃহীত নারীর ব্যক্তিত্ব মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তাদের জীবনে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই সামাজিক বিপ্লবের প্রধান নেতা রামমোহনের নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে রইল।

সতীদাহ নিবারণ ছাড়াও নারীদের কল্যাণের জন্য আরও কয়েকটি প্রথার সংস্কার সাধন করতে ব্রতী হয়েছিলেন রামমোহন। তাঁর সময়ে সমাজে বহু-বিবাহের প্রচলন ছিল। ছিল কৌলিন্য প্রথা, ছিল বাল্যবিবাহ ও কন্যাপণ।

বহু-বিবাহ ছিল সেকালের এক সামাজিক কলঙ্ক। এর জন্য নারীর জীবন হত দুর্বিষহ। তাদের অশ্রু ও বেদনার কাহিনী তো

কারুর অজানা নয়। নারীদের প্রতি পুরুষদের অবহেলা, অসম্মান ও অন্যায় আচরণ রামমোহনের দরদী মনে আলোড়নের সৃষ্টি করে। তিনি এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। শাস্ত্র মন্থন করে তিনি প্রমাণ করেন, বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। তিনি বলেন, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ ছাড়া একাধিক বিবাহের বিধি শাস্ত্রে নেই। গভর্ণমেণ্টের কাছে তাই তিনি সুপারিশ করেন "কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোন রাজকর্মচারীর নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহার স্ত্রীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন দোষ আছে। প্রমাণ করিতে সমর্থ না হইলে সে পুনর্বার বিবাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না।"

অর্থের লোভে কন্যাকে রুগ্ন, বৃদ্ধ এমন কি বিকলাঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রথাও সে যুগে প্রচলিত ছিল। এর ফলে এই সকল কন্যার জীবন বিষময় হয়ে উঠত। বৈধব্যদশা ঘটত অল্পকালের মধ্যেই, জীবনের সকল সুখ শান্তির অবসান ঘটত স্বামীর মৃত্যুতে। রামমোহন এর বিরুদ্ধেও লেখনী ধারণ করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দুনারীকে যে কত অসহায় অবস্থায় পড়তে হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রামমোহনের সময়ে প্রচলিত দায়াধিকার ব্যবস্থার মধ্যে। মৃত পতির সম্পত্তিতে স্ত্রীব কোন অধিকার ছিল না। জীবিত কালে ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করত তার স্বামী, কিন্তু তার মৃত্যুর পর সে হত অসহায়, পুত্রের পুত্রবধূর বা আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়েই থাকতে হত তাকে। সব থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সর্বহারা হয়েই দিন কাটাতে হত তাকে। তিরস্কার লাঞ্ছনা গঞ্জনা জুটতো তার ভাগ্যে।

রামমোহন এই অবিচার, এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি শাস্ত্রের নজীর উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন, প্রাচীন ঋষিরা বিধান দিয়েছিলেন মৃত স্বামীর বিষয় সম্পত্তিতে পুত্রগণের ন্যায় স্ত্রীও সমান উত্তারাধিকারিণী। তাকে কোন ক্রমেই বঞ্চিত

করবার নির্দেশ শাস্ত্রে লেখা নেই। এমন কি একাধিক পত্নী থাকলেও তারা প্রত্যেকেই হবে মৃত স্বামীর সম্পত্তির সমান অধিকারিণী। রামমোহন অভিযোগ করেন, পরবর্তী শাস্ত্রকারেরা প্রকৃত শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করে ন্যায্য অধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিত করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন, দায়াধিকারের এই প্রচলিত ব্যবস্থা বাংলাদেশে সহমরণ ও বহু-বিবাহের আধিক্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

রামমোহন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে অবতীর্ণ হন নি সত্য, কিন্তু তিনি যে এর বিরোধী ছিলেন তার প্রমাণ আছে।

ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, 'বজ্রসূচী' গ্রন্থখানি অতিশয় তীব্র ভাষায় অথচ অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে লেখা। রাজা রামমোহন এই গ্রন্থখানি দেখিয়া তাহার বিচারপ্রণালীতে বিস্মিত হইলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এর প্রথম নির্ণয়টি অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে রামমোহনের অভিমত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে প্রকাশ পেয়েছে।

আর একটি কুপ্রথার বিরুদ্ধেও রামমোহন খড়্গহস্ত ছিলেন। আত্মা গঙ্গার জলে পবিত্র হয়ে স্বর্গে যাবে এই আশায় মুমূর্ষুকে সেকালে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে জলে ডোবানোর রীতি প্রচলিত ছিল। একে 'ঘাট-হত্যা' বলে নিন্দা করেছেন রামকমল সেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, "মুমূর্ষুকে নদীতে নিয়ে যাওয়ার প্রথাকে কলকাতায় যিনি প্রথম ধিক্কার জানিয়েছিলেন তিনি হলেন রামমোহন রায়।"

বাংলা সাহিত্য সেবা

সকল দেশের সাহিত্যেই মনের ভাব প্রথম প্রকাশলাভ করেছে কাব্যের মাধ্যমে, গদ্য এসেছে অনেক পরে। বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কাব্যেরই ছিল অপ্রতিহত প্রাধান্য। অবশ্য বাংলা গদ্য যে ব্যবহৃত হত না তা নয়, তবে তার ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমিত। চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা প্রভৃতিতেই গদ্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

বাংলাদেশে খৃস্টান মিশনারীদের আগমন, বিশেষত ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়াপত্তনে প্রভূত সাহায্য করে। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের তরুণ সিভিলিয়ান ছাত্রদের পঠন পাঠনের জন্য প্রয়োজন হয় বাংলা গদ্যে লিখিত পাঠ্যপুস্তক। এই অভাব দূর করেন উইলিয়ম্ কেরি এবং তাঁর সুযোগ্য সহকারী রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুনশী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতগণ। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে তাঁর দান অবিস্মরণীয়।

পণ্ডিত মুন্শীরা কিন্তু গ্রন্থ রচনা করেন প্রয়োজনের তাগিদে, নিছক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় নয়। তাঁদের ভাষা ছিল শ্লথগতি, আড়ষ্ট এবং ফার্সী ও সংস্কৃত শব্দের বহুল মিশ্রণে ভারাক্রান্ত ও প্রায় দুর্বোধ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যের আসরে রামমোহনের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মহৎ প্রেরণাই তাঁকে লেখনী ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল অর্থাৎ প্রায় ১৬ বছরের মধ্যেই নানা বিষয়ে পুস্তক পুস্তিকা রচনা করে তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

রামমোহন বাংলা গদ্য-সাহিত্যে এক বিশিষ্ট রচনাশৈলী ও নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর রচনার মধ্যে তাই মননশীলতা এবং জটিল দুরূহ বিষয় বিশ্লেষণ করার অসাধারণ দক্ষতা সুস্পষ্ট।

বাংলা ভাষায় বেদান্ত গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশ করেন রামমোহন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে বেদ উপনিষদের চর্চা প্রায় লুপ্ত হয়েই গিয়েছিল। পণ্ডিতেরা পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনেই ব্যাপৃত থাকতেন। রামমোহনই আমাদের দেশে বেদান্ত-চর্চার পথ সুগম করেন। বাংলা ভাষায় তিনিই বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার।

রামমোহন বাংলা গদ্যকে সহজ সরলভাবে প্রকাশ করবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দের অনাবশ্যক শৃঙ্খল থেকে ভাষাকে মুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বাংলা রচনা যাতে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় তার প্রচেষ্টাই তিনি করেন। এই উদ্দেশ্যেই বেদান্তের মত দুরূহ বিষয়কেও সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে প্রয়াসী হন।

রামমোহনই প্রথম বিচার বিতর্কমূলক রচনা প্রকাশ করেন। জনকল্যাণের স্বার্থে পাদ্রী ও পণ্ডিতদের সঙ্গে সমাজ, ধর্ম, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনিই প্রথম বিচার ও বিতর্কের অবতারণা করেন। তাঁর পূর্বে বাংলা গদ্যে রাজনীতি, ধর্ম, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা প্রকাশিত হয়নি। অনুবাদের সাহায্যে, বিতর্কমূলক রচনার মাধ্যমে এবং সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে তিনি এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত করেন। এর ফলে বাংলা গদ্যের পরিধি যেমন বিস্তৃত হয় তেমনি বিচিত্র ভাবধারায়ও সমৃদ্ধ হয়।

বাংলা গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার পথপ্রদর্শক হচ্ছেন

রামমোহন। এ কৃতিত্ব অসাধারণ। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি বাঙালীর মানসলোকের দিগন্ত প্রসারিত করেন।

রামমোহন তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থের' অনুষ্ঠানপত্রে কি পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশও দিয়ে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর উক্তি স্মরণীয়, —"রামমোহন রায় বাংলা ভাষার শুধু প্রথম গদ্য লেখক নন, গদ্য রচনার প্রকরণ পদ্ধতি ও বিধিনিষেধও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও তার বাক্য গঠন-প্রণালীও যে বিভিন্ন, এ বিষয়ে তিনি সর্ব প্রথমে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কি পদ্ধতি অনুসারে বাংলায় বাক্য গঠন করতে হয় তার নিয়মাবলীর প্রতিষ্ঠা রামমোহনই প্রথম করেছেন।"

রামমোহন বলেন, "প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে, এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ

করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।" [বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫)]

বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই তত্ত্বপ্রধান গানগুলি শুধু তাঁর কবিত্বশক্তির নিদর্শন নয়, তাঁর বৈদান্তিক মানসেরও প্রোজ্জ্বল প্রকাশ। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রসারিত। রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, "তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত বোধহয় পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয় নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। এ সকল গীত যেরূপ প্রকার ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সমন্বিত ; অনেক কলাবতে সমাদর পূর্বক ইহা গাহিয়া থাকেন।"

রামমোহনের কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হল—

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল, তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভোল তাঁরে, এ ত ভাল নয়।

* * *

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি॥
দেশেভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতি ক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥

* * *

মনে স্থির করিয়াছ চিরদিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন মনে রবে সমভাবে॥
এই আশা তরুতলে বসিয়াছি কুতূহলে।
বিষয় করিয়া কোলে, জাননা ত্যজিতে হবে।
আরে মন শুন সার, দিবা অন্তে অন্ধকার
সুখান্তে দুঃখেরি ভার, সহিতে হবে—
অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ।
ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্মল আনন্দ পাবে॥

*　　*　　*

মনে কর শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর!
অন্যে বাক্য কবে কিছু, তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া　　কি বা পুত্র কি বা জায়া
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ　　সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সমাধান　　ত্যজ দম্ভ অভিমান
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

*　　*　　*

কে ভুলালো হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়।
আপনি গড়হ যাকে
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।

প্রভু বলি মান যারে,
সম্মুখে নাচাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায় ?

বাংলা ও ইংরেজীতে লেখা রামমোহনের রচনার সংখ্যা কম নয়। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে অন্য কোন গ্রন্থকার এত বেশি এবং এত বিচিত্র বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজী পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করেন নি, এত চিঠিপত্রও লেখেন নি। রামমোহনের বাংলা রচনার একটি তালিকা দেওয়া হল।—

বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), তবলকার উপনিষৎ (কেনোপনিষৎ) ১৮১৬, ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মুণ্ডক্যোপনিষৎ (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৮, ১৮১৯), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০) চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২), পাদরি ও শিষ্য সংবাদ (১৮২৩), প্রার্থনা পত্র (১৮২৩), গুরুপাদুকা (১৮২৩), পথ্যপ্রদান (১৮২৩), ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬), কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার (১৮২৬), বজ্রসূচী (১৮২৭), ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮), ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮), অনুষ্ঠান (১৮২৯), সহমরণ বিষয় (১৮২৯), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) ইত্যাদি।

কেরি ও হ্যালহেড ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। রামমোহনও য়ুরোপীয়দের বাংলা শেখার জন্য ইংরেজীতেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে। সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা বলেন, “শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় যিনি আপন নৈপুণ্য ও সৌজন্য দ্বারা সর্বত্র ধন্য ধন্যরূপে

বিখ্যাত হইয়াছেন তিনি সম্প্রতি বাঙ্গলা ভাষা সুন্দররূপ শিক্ষার কারণ বিস্তর তর্কানুতর্কদ্বারা নির্য্যাস করিয়া ভাষাতে এক ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

বাংলা ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করবার উদ্দেশ্যে তিনি সাধারণ পাঠকের জন্য তাঁর ইংরাজী ব্যাকরণের অনুসরণে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করেন। ইংলণ্ড যাত্রার পূর্বে তিনি এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার দিয়ে যান কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উপর। গৌড়ীয় ব্যাকরণ সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বাংলা সাহিত্য আজ সুসমৃদ্ধ। বহু মনীষীর সাধনার ফলে সম্ভব হয়েছে তার এই অসামান্য সমৃদ্ধি। কিন্তু বাংলা গদ্যের প্রভাত-লগ্নে, তার হাঁটি-হাঁটি-পা-ফেলার যুগে, যে মনীষী পাঠ্য পুস্তকের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে একে মুক্ত করে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন, যিনি একে ঋজুতা ও গতিশীলতা দান করেন, রবীন্দ্রনাথের কথায়, "যিনি বঙ্গসাহিত্যেকে গ্রানিট্ স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন," তিনিই মহাত্মা রামমোহন। তাঁকে আমরা সাহিত্যের সুনিপুণ শিল্পী না বলতে পারি কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গুরু বলে স্বীকার করতে যেন কুণ্ঠিত না হই।

সাময়িক পত্র প্রকাশ

বাঙলায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। বাঙলা তথা ভারতের প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় কলকাতায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী। পত্রিকাটি প্রকাশ করেন জেমস আগষ্টাস হিকি। পত্রিকার নাম 'বেঙ্গল গেজেট।'

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন।' এই মাসিক পত্রটি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। এই বছরই ২৩মে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণ'। এর অল্পদিন পরে ১৮১৮ সালেই কলকাতা চোরবাগান থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বাঙ্গাল গেজেটি'।

বাঙলা সাময়িক পত্রের গোড়ার কথা বলতে হলে প্রথমেই স্মরণ করতে হবে রামমোহন রায়কে। রামমোহনই জাতীয় সংবাদপত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন সার্থক বাঙালী সাংবাদিক। 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। এর পরিচালনায় ছিল না কোন মিশনারী, ছিল না কোন অবাঙালী। এই পত্রিকা ছিল জনমত গঠনের যুগোপযোগী মাধ্যম। শুধু তাই নয়, রামমোহনই প্রথম বাঙালী যিনি সংবাদপত্র দমন আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন এবং তার শৃঙ্খল মোচন করতে প্রয়াসী হন। এ ছাড়া বাংলা থেকে প্রথম ফার্সী ভাষায় মুদ্রিত পত্রিকা তিনিই প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্মণ সেবধি : ১৮২১

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা প্রকাশ করতেন শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরা। এই পত্রিকার ১৮২১ সালের একটি সংখ্যায় প্রশ্নের আকারে এক ব্যক্তির একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। রচনাটি চোখে পড়া মাত্রই রামমোহন বুঝতে পারেন মিশনারীরা হিন্দুধর্মের প্রতি অযথা আক্রমণ করেছে এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা তাঁর কর্তব্য। তাই তিনি তাঁর প্রিয় পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মার নামে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই পত্রিকার সম্পাদক রচনাটির সকল অংশ প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। এরপর রামমোহনের মত স্বাধীনচেতা পুরুষের যা করা উচিত তিনি তাই করলেন। প্রকাশ করলেন এক সাময়িক পত্রিকা।

মিশনারীদের কুৎসার যোগ্য উত্তর দিলেন তিনি এই পত্রিকারই মাধ্যমে। এই পত্রিকার নাম 'ব্রাহ্মণ সেবধি—ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন'। ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর প্রকাশ। এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হত। পত্রিকাটিতে প্রকাশকের নাম শিবপ্রসাদ শর্মা থাকলেও রামমোহনই ছিলেন এর প্রকৃত পরিচালক ও লেখক। এ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ সেবধি পত্রিকার কয়েকটি মাত্র সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রথম সাখ্যায় একটি মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়। খৃষ্টানেরা হিন্দু ও মুসলমানধর্মের নিন্দা করে তাদের ধর্ম কেমন করে প্রচার করত সেকালে তা অল্প পরিসরে বলা হয়েছে এখানে। এই গ্রন্থের 'পাদরীদের সঙ্গে বিচার' অধ্যায়ে ঐ রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সম্বাদ কৌমুদী : ১৮২১

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ ॥

এই শ্লোকটিকে শিরোভূষণ করে ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল—সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা, দেশ-বিদেশের সংবাদ প্রচার এবং নানা সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

নামে যিনিই সম্পাদক থাকুন না কেন, কার্যত রামমোহন-ই যে 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই পত্রিকায় সহমরণের বিরুদ্ধেও রচনা প্রকাশিত হত। এই কারণে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কৌমুদী' পত্রিকার ১৩টি সংখ্যা প্রকাশের পর এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেই 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন (৫ মার্চ, ১৮২২)।

রামমোহন গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় রাজনারায়ণ বসু রামমোহনের এই পত্রিকা সম্বন্ধে লিখেছেন—

'এই 'সম্বাদ কৌমুদী'তে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমন্বিত যে সকল লোকোপকারী বিষয় লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতীতি হইবে যে রামমোহন রায় যে কেবল ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে লিখিতে পারিতেন তাহা নহে, জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায় গদ্য রচনার বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রথম নির্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লিখাতে তাঁহাকে বর্তমান গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা বলিতে হইবে।'

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'সম্বাদ কৌমুদী'র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। জনসাধারণের কল্যাণসাধন করাই ছিল এই

।ত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন প্রশ্নই জড়িত ছিল ।। এর সঙ্গে। এর অনুষ্ঠানপত্রে বলা হয়, এই কাগজ সম্পূর্ণ দশবাসীর দ্বারা পরিচালিত এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত। এর ষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও নতুনত্ব ছিল। 'সম্বাদ কৌমুদী'কে বাংলাভাষায় প্রকাশিত ও সম্পূর্ণ বাঙালী দ্বারা পরিচালিত প্রথম জাতীয়তাবাদী ।ত্রিকা বলা যেতে পারে।

'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় দেশহিতকর অনেক বিষয়ই প্রকাশিত ত। নীচে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হল:

বিদেশী ভাষা শিক্ষা করার আগে নিজের দেশের ভাষা শিক্ষা রা প্রয়োজন। নিজের ভাষায় জ্ঞান না থাকলে বিদেশী ভাষা ালভাবে শেখা যায় না।

খৃষ্টানদের কবরখানার অভাব নেই। কিন্তু হিন্দুদের শবদাহের ন্য কলকাতায় কেবল একটি মাত্র শ্মশান ঘাট আছে। এই অসুবিধা র করার জন্য গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন।

অর্থাভাবে দরিদ্রেরা মৃতদেহ দাহ করতে পারে না। গঙ্গার জলে ফলে দেয়। এদের সাহায্য করবার জন্য ধনীদের কাছে আবেদন।

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা বিপন্ন হয়। তাদের সাহায্য করবার ন্য একটি সমিতি গঠন করা কর্তব্য। ধনীদের কাছে একটি 'ফাণ্ড' াপন করবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

দরিদ্র অথচ ভদ্র হিন্দু সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিনা বেতনে বদ্যালয় স্থাপন করতে গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন।

বিভিন্ন আদালতে জুরির সাহায্যে বিচার প্রবর্তনের জন্য ভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন।

লালবাজার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত চিৎপুর রোডে জল দেওয়ার বস্থা করতে ধনীদের কাছে অনুরোধ।—জনৈক পত্রপ্রেরকের চিঠি।

মীরাৎ-উল-আখ্‌বর : ১৮২২

ফার্সী ভাষার তখন ছিল প্রচুর সমাদর। রামমোহন ফার্সী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই ভাষাতেই তিনি এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮২২ সালের এপ্রিল মাসে। এই পত্রিকার নাম 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বর।' এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত ফার্সী ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র।

মীরাৎ পত্রিকার অধিকাংশ রচনাই লিখতেন রামমোহন এবং অনেকগুলো লেখার অনুবাদ জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জার্নালে' প্রকাশিত হয়। দেশ বিদেশের নানা সংবাদ এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা মীরাৎ পত্রিকায় প্রকাশ করা হত। এমন কি খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তাঁর স্বাধীন মত প্রকাশ করে রামমোহন খৃষ্টানদের বিরাগভাজন হন।

১৮২৩ সালের কথা। অস্থায়ী বড়লাট জন অ্যাডাম বিলাতের কর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করে এই বৎসরেরই ৪ঠা মার্চ এক কড়া প্রেস আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরে ৪ঠা এপ্রিল এই আইন জারি করা হয়। এর উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ করা। এই আইন অনুসারে কোন সাময়িক-পত্র প্রকাশ করবার পূর্বে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্র গ্রহণ করতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হলফ করে সেই হলফনামা চীফ্ সেক্রেটারীর কাছে পাঠাতে হবে। তিনিই লাইসেন্স দেবেন। কি কি বিষয়ের আলোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলবে না তারও মুদ্রিত বিবরণ সম্পাদকের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। নিষিদ্ধ বিষয়ের কোনো আলোচনা প্রকাশিত হলে পত্রিকার লাইসেন্স বাতিল করা হবে, এমন কি অর্থদণ্ডেরও ব্যবস্থা করা হবে এই নিয়মও করা হয়।

সংবাদপত্রের উপর হস্তক্ষেপ রামমোহন বরদাস্ত করতে পারলেন

না। অবমাননাকর সর্ত মেনে নিয়ে তাঁর মত স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে সাময়িক-পত্র প্রকাশ করা সম্ভব হল না। তিনি তাই মীরাৎ-উল-আখ্‌বর প্রকাশ বন্ধ করেই দিলেন। পত্রিকাটির শেষ সংখ্যায় কেন তিনি কাগজ বন্ধ করলেন তার কারণ পাঠকদের জানিয়ে দিলেন। রামমোহনের আত্মসম্মানবোধ কত গভীর ছিল তার পরিচয় মেলে তাঁর এই রচনায়।

রামমোহন যে তিনটি বিশেষ কারণ উল্লেখ করে তাঁর পত্রিকা বন্ধ করেন তা হল প্রথমত, লাইসেন্স গ্রহণ করবার জন্য প্রধান সেক্রেটারীর কাছে ধর্না দেওয়া তাঁর পক্ষে দুরূহ। এবং নিষ্প্রয়োজনও। তিনি বলেন।

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ,—যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়ত, "প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।"

"তৃতীয়ত,···গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে···।"

কিন্তু শুধু পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করলেই তো কর্তব্য শেষ হয় না। রামমোহন ছিলেন শক্ত ধাতুতে তৈরী মানুষ। সংবাদপত্রের এই স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। প্রথমেই তিনি সুপ্রিম কোর্টের কাছে নানা যুক্তি দিয়ে এক আবেদনপত্র পাঠালেন। এরপর তিনি আর একটি আবেদনপত্র পাঠালেন সকৌন্সিল ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে।

এই আবেদনপত্রটিতে রামমোহন ইংলণ্ডের প্রজারা যে সকল নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করছে সেই সব অধিকার থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা যে উচিত নয় তা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের পথ যদি রুদ্ধ করা হয় তাহলে শাসক ও শাসিত উভয়েরই চরম ক্ষতির সম্ভাবনা। এই আবেদনপত্র সম্বন্ধে মিস্ কোলেট বলেছেন ঃ—

"The appeal is one of the noblest pieces of English to which Rammohun put his hand. Its stately periods and not less stately thought recall the eloquence of the great orators of a century ago. In language and style for ever associated with the glorious vindication o liberty, it invokes against the arbitrary exercise of British power, the principles and traditions which are distinctive of British History"

রামমোহনের কথায় সেদিন প্রিভি কাউন্সিল কর্ণপাত করে নি। কিন্তু স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফ্ ১৮৩৫ সালে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন রামমোহন জীবিত ছিলেন না বটে, কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন যে সংগ্রাম করেছিলেন তা তাঁর অজানা ছিল না। আমাদের দেশে রামমোহনই প্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন।

ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা

একদিন ইউনিটেরিয়ান সভার উপাসনা সেরে রামমোহন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছেন। পথে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বললেন, 'বিদেশী উপাসনা গৃহে আমাদের যাবার কি দরকার? আমরা কি নিজেরাই একটা উপাসনা মন্দির স্থাপন করতে পারি না?'

কথাগুলো রামমোহনের খুবই ভাল লাগল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করলেন। সকলেই উপাসনালয় স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন সবাই।

সভা স্থাপনের কাজ আরম্ভ হতে দেরী হল না। জোড়াসাঁকোর চীৎপুর রোডের উপর কমল বসুর বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। এখানেই ২০শে আগষ্ট, ১৮২৮ সালে উপাসনা সভার প্রথম অধিবেশন বসল।

উৎসাহের সঙ্গেই সভার কাজ চলতে লাগল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত সভার কাজ চলত। বেদ উপনিষদ পাঠ হত এখানে। এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পাঠ করতেন বেদ আর উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ পাঠ করতেন উপনিষদ। বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করতেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সভা শেষ হবার পূর্বে ধর্ম-সঙ্গীত গীত হত। গান গাইতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী, পাখোয়াজ বাজাতেন গোলাম আব্বাস।

বছর দুই ভাড়া বাড়িতেই অধিবেশন চলতে থাকে। এরপর অর্থ সংগ্রহ করে জোড়াসাঁকোতেই চার কাঠা দু'ছটাক জমি কেনা হয়। জমির জন্য দাম দিতে হয় ৪২০০ টাকা। দলিল লেখা হয় মাত্র কুড়ি টাকার স্ট্যাম্পে। জোড়াসাঁকো তখন ছিল সুতানটীর অন্তর্গত।

রামমোহনের জীবনে ১৮৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারী বিশেষ

স্মরণীয় দিন। নব-নির্মিত ভবনে এদিন স্বুরু হয় উপাসনা, একমেবা-দ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের সাধনা। এতদিন পর তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হয়। স্থাপিত হয় ব্রহ্মসভা, যাকে এখন আমরা বলি ব্রাহ্ম সমাজ। উদ্বোধনের দিন উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব ছিল না, অভাব ছিল না সমারোহের। প্রায় পাঁচশো হিন্দু উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেবাব ব্যবস্থা কবা হয়েছিল। মণ্টগোমারি মার্টিন নামে এক ইংরেজও সেদিন এই ব্রহ্মসভায় উপস্থিত ছিলেন।

রামমোহনেব ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি কবে, সৃষ্টি কবে চরম বিদ্বেষ ও তীব্র বিরোধ। রামমোহনের কার্যকলাপ তারা কখনও সমর্থন করেনি। এবার তারা চরম আঘাত হানবার চেষ্টা করল। কেউ বললে এটা ভজনালয় নয়, ভোজনালয়। কেউ বললে, এটা জলসাঘর—নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদের আড্ডা। এমনি অনেক কুকথা প্রচার করেছিল বিরোধীরা। হাটে-বাজারে, বৈঠকখানায়, চণ্ডীমণ্ডপে, পথে ঘাটে সর্বত্রই রামমোহনের বিরুদ্ধে নিন্দা কুৎসা ছড়াতে লাগল। এমন কি তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টাও করেছিল তারা।

বামমোহন যখন ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন তখন দেশে সতীদাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে তুমুল আন্দোলন চলছিল। এই সময়েই রামমোহনের বিরোধীপক্ষেবা বাধাকান্ত দেবকে সভাপতি করে ধর্মসভা স্থাপন করে। ধর্মসভার মুখপত্র ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' আর রামমোহনের মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী'। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় রামমোহনেব বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, নিন্দা কুৎসা প্রচাবিত হতে লাগল আর রামমোহনের পত্রিকা তার উত্তর দিতে থাকল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের অতি সংকটকাল ছিল। কেহ

বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন। কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথযাত্রী দূর হইতে পদব্রজে আইসেন তেমনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে এই সভায় আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন।”

ব্রহ্মসভা স্থাপন রামমোহনের মহৎ কীর্তি। এর পরিচালনার জন্য ১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ারী যে ট্রাস্ট ডিড বা ন্যাসপত্র সম্পন্ন হয় তা এক মূল্যবান দলিল। এতে আছে রামমোহনের উদার ধর্মমতের স্বাক্ষর। ব্রহ্মসভা স্থাপনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, “হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিন্তানায়ক এবং উদার সাধকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাহাতে একে অন্যের ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ও কল্যাণের সন্ধান পাইতে পারেন এবং এই সন্ধান পাইয়া একে অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারেন, ইহাই রাজার ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। সেই মহামিলন ক্ষেত্রের পথ গড়িয়া তুলিবার আশাতেই রাজা ‘ব্রহ্মসভার’ প্রতিষ্ঠা করেন।…রাজা ব্রাহ্মধর্ম নামে কোনও নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজ নামে কোনও সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই”।

যে বছর ব্রহ্মসভার জন্য নতুন বাড়ি তৈরি হয় সেই বছরের শেষের দিকেই রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। ব্রহ্মসভার পরিচালনার ভার দিয়ে যান রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপর। কিন্তু রামমোহন চলে যাওয়ার পর ব্রহ্মসভার আকর্ষণ কমে যায়। তাঁর অনেক বন্ধু আর উপাসনায় যোগ দেন না। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, মহর্ষি “দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রহ্মসভায় গিয়া তাহার অবস্থা কেমনতর দেখিয়াছিলেন তাহা কয়েকজন বন্ধুকে গল্পচ্ছলে একদিন বলিয়াছিলেন, ‘যে সকল ধনীলোক রাজার

জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, রাজার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় আসিলে পরেই, তাঁহারা সমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন।'

অধ্যাপক বল লিখেছেন, ব্রহ্মসভা স্থাপনের সময়েই রামমোহনকে অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হয়। তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আপার সার্কুলার রোডের বাড়িটি নীলামে বিক্রি হয়ে যায়। বিক্রয়ের এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় বাড়ি ও বাগান সমেত জায়গা ছিল ১৫ বিঘা, এবং এর ভিতর ছিল একটা বড় বাগান। এই বাড়ির দ্বিতলে ছিল তিনটি হলঘর, ৬টি ঘর, দুটো বারান্দা। এবং নীচের তলায় ছিল কয়েকটি ঘর এবং গুদামঘর, রান্নাঘর এবং আস্তাবল। কম্পাউণ্ডের ভেতর ছিল তিনটা বড় পুকুর।

রাজনীতি ও অর্থনীতি

রামমোহনের সময়ে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে জনসাধারণ বিশেষ সচেতন ছিল না। অভ্যস্ত ছিল গতানুগতিক চিন্তায় ও সীমাবদ্ধ কর্মপ্রয়াসে। রামমোহনই প্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবী আদায় করবার তিনিই পথ-প্রদর্শক। তিনি যে কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং সমাজ সংস্কারের প্রবর্তক ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন নবভারতের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জনক। এই কথাই বলেছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ :

"For let it be remembered that Rammohan Roy was not only the founder of Brahma Samaj and the pioneer of all social reform in Bengal, but he was the father of constitutional agitation in India. It is remarkable how he anticipated us in some of the great political problems which are the problems of today."

রামমোহনের সময়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে, শাসন ও শোষণ সুরু হয়ে গিয়েছে পুরাদমে। দোর্দণ্ড-প্রতাপ ইংরেজরা 'বণিকের মানদণ্ড' ছেড়ে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হয়ে উঠেছে। দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করার চিন্তা সে যুগে কারুর মনে উদয় হয় নি, উদয় হওয়া হয়ত সম্ভবও ছিল না। তাই ইংরেজ শাসনকে বরণ করে নেওয়া ছাড়া তখন গত্যন্তর ছিল না। রামমোহনও ইংরেজদের উপর বা ইংরেজ গভর্নমেণ্টের উপর বিরূপ ছিলেন না। তিনি মনে করতেন ইংরেজরা অনেক সদ্গুণের

অধিকারী, ইংরেজদের শাসনে থাকলে ভারতের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে অনেক। কিন্তু তাই বলে ইংরেজেরা জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার পদদলিত করবে, তাদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে, বা অকল্যাণকর নিয়মকানুন প্রবর্তন করবে, রামমোহন এসব কখনই সমর্থন করতেন না। তাই যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখনই তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন, জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, দেশবাসীকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। সুবিচার প্রার্থী হয়ে তিনি বারবার গভর্নমেণ্টের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর আবেদন, তাঁর অভিযোগ, তাঁর প্রতিবাদ।

রামমোহন ১৮২৭ সালে জুরি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই আইনের বলে যে কোন খৃষ্টান (এমন কি নেটিভ খৃষ্টানও) জুরিতে বসার অধিকার লাভ করবেন এবং হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদের বিচার করতে পারবেন। কিন্তু কোন হিন্দু বা মুসলমান জুরিতে বসে খৃষ্টানদের বিচার করতে পারবেন না।

এই বৈষম্যমূলক বিধানের বিরুদ্ধে রামমোহন লেখনী ধারণ করেন। এই অনিষ্টকর আইন রহিত করবার জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র পাঠান পার্লামেণ্টে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন। রামমোহনের প্রচেষ্টা সফল হয়। ১৮৩২ সালে ভারতীয়েরা জুরিতে বসবার অধিকার লাভ করে।

বাংলাদেশে জীমূতবাহনের দায়ভাগ শাস্ত্র অনুসারেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছিল। এই দায়ভাগ অনুসারে পুত্র ও পৌত্রের সম্মতি ব্যতিরেকেই পিতা তার পৈত্রিক সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করতে পারত। এই ছিল চিরাচরিত নিয়ম। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার চার্লস গ্রে উত্তরাধিকারের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে একটি মোকদ্দমায় রায় দেন যে, পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করে কোন ব্যক্তি পৈত্রিক সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করতে পারবেন না। এই রায়ের বিরুদ্ধে রামমোহন ইংরেজীতে

এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন এবং যুক্তি দিয়ে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ উল্লেখ করে প্রতিপন্ন করেন যে, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কাজ করলে হিন্দু সমাজের প্রভূত ক্ষতি হবে। কেবল পুস্তিকা লিখেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। এই ক্ষতিকর বিধি ব্যবস্থা রহিত করবার জন্য প্রিভি কাউন্সিলেও আপিল করেন। শেষে তাঁর বক্তব্যই গৃহীত হয়। প্রিভি কাউন্সিল সুপ্রীম কোর্টের রায় নাকচ করে দেয়।

স্বদেশবাসীদের স্বার্থের প্রতি রামমোহনের দৃষ্টি ছিল প্রখর। যখনই গভর্নমেণ্ট কোন অন্যায় আইন প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেছে তখনই রামমোহন এগিয়ে এসেছেন তীব্র প্রতিবাদ জানাতে। ১৮২৮ সালে গভর্নমেণ্ট লাখেরাজ ভূমি বিষয়ক আইন প্রবর্তন করেন। প্রজাদের স্বার্থবিরোধী বলে রামমোহন এর বিরুদ্ধে বড়লাটের কাছে আবেদন করেন। এখানে তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হলে বিলাতে আপীল করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এখানে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

দেশ বিদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে রামমোহনের গভীর জ্ঞান ছিল। পাশ্চাত্য দেশের মনীষীদের নানা গ্রন্থ পাঠ করতেন তিনি এবং সাময়িক পত্র থেকেও রাজনৈতিক ঘটনার সংবাদ সাগ্রহে সংগ্রহ করতেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি কোনো সংকীর্ণ নীতি বা মতবাদ পোষণ করতেন না। তাঁর মনোভাব ছিল অত্যন্ত উদার এবং আন্তর্জাতিক। কোনো দেশে ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে শুনলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না। আবার কোনো স্থানে অন্যায় ও অবিচার জয়ী হলে তিনি গভীর দুঃখ ও বেদনা বোধ করতেন। সাম্য ও স্বাধীনতার এমন পূজারী কে ছিলেন তাঁর যুগে ?

কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি এখানে :

রামমোহন যেদিন জানতে পারলেন যে নেপলসের অধিবাসীরা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেও অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়েছে তখন তিনি দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। সেদিন সন্ধ্যায় বাকিংহাম

সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সংবাদ শুনে তিনি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর পক্ষে সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভবই হয়নি। তিনি তাঁকে চিঠি লিখে জানান।

'I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening, more especially as my mind is depressed by the late news from Europe……I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends to despotism have never been and never will be, ultimately successful'.

এই চিঠির মধ্যে রামমোহনের রাষ্ট্রনীতি-চিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, যারা স্বাধীনতার শত্রু, যারা স্বৈরাচারের পৃষ্ঠপোষক তারা অতীতে কখনও সাফল্যলাভ করেনি, ভবিষ্যতেও কোনো দিন সাফল্যলাভ করবে না।

একদিন যখন স্পেন দেশের নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংবাদ রামমোহনের কাছে পৌঁছল, তখন আনন্দে তিনি এমনই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন যে নিজের বাড়িতেই তিনি এক ভোজের ব্যবস্থা করে ফেললেন। এই ভূরিভোজে সেদিন প্রায় পঞ্চাশজন বিশিষ্ট য়ুরোপীয় অতিথি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং রামমোহন ইংরেজীতে এক সময়োচিত বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডে যাবার পথে যখন তিনি নেটাল বন্দরের কাছে ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে দেখতে পান তখন তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে আসবার সময় ডেকের উপর পা পিছলে পড়ে যান। পায়ে লাগে ভীষণ আঘাত। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করেই সেই জাহাজে গিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ফিরবার সময় 'ধন্য ফ্রান্স, ধন্য ধন্য' বলতে থাকেন। ইংলণ্ডে যখন প্রোটেস্টেন্ট ও রোমান

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও রামমোহন আনন্দ প্রকাশ করেন।

রামমোহন কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল বাস্তব, উদার ও ইতিহাস-ভিত্তিক। তিনি বলেছেন, 'সমস্ত পৃথিবীতে যে সংগ্রাম চলেছে তা কেবলমাত্র সংস্কারক ও সংস্কার বিরোধীদের মধ্যে নয়—তা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ও স্বৈরাচারের মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, ন্যায়বিচার ও অবিচারের মধ্যে। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণমনা ও স্বৈরাচারীরা শেষ পর্যন্ত ন্যায়নীতির সমর্থকগণের নিকট পরাজিত হয়েছে'।

১৮৩১-৩২ সালের কথা। রামমোহন তখন বিলাতে। এই সময়ে ভারতের শাসন প্রণালীর বিষয় অনুসন্ধান করবার জন্য বৃটীশ পার্লামেণ্ট এক কমিটি গঠন করে। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কমিটির কাছে তাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। রামমোহনকেও ভারত সংক্রান্ত নানা প্রকার প্রশ্ন করা হয়। তিনি এই সব প্রশ্নের লিখিত জবাব দেন।

ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে রামমোহনের অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। দেশের কল্যাণচিন্তা কত গভীর ও ব্যাপক ছিল তার স্বাক্ষর আছে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ও সুপারিশের মধ্যে।

রামমোহন বলেন, বাংলার কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তারা জমিদার, আমীন, রাজস্ব আদায়কারীদের শোষণ ও ষড়যন্ত্রের শিকার। ফসল ভাল হলেও তাদের দুঃখের অবসান ঘটে না। অনেক সময় দামও চড়ে যায়। এর ফলে সব ফসলটাই তাদের বেচে দিতে হয় জমিদারকে খাজনা দেবার জন্য। চাষীরা এত গরীব ও নিরীহ যে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তারা আইনের সাহায্য নিতে পারে না। আর গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে তো তারা সাহায্যই পায় না। রামমোহন বলেন, এদের কথা ভাবলে আমার গভীর দুঃখ হয়।

উচ্চপদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হত না সেকালে। অনভিজ্ঞ তরুণ ইংরাজ সিভিলিয়নদেরই উচ্চপদে নিযুক্ত করা হত। রামমোহন এই একচেটিয়া ব্যবস্থা পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, ভারতের শিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তিদের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হোক। এদের কলেক্টর বা জজের পদ দিলে গভর্নমেণ্টের কাজ ভাল ভাবেই চলবে। আর্থিক দিক থেকেও গভর্নমেণ্ট লাভবান হবে। অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ ইংরাজ সিভিলিয়নদের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। এদের জ্ঞান, বিচার বিবেচনা শক্তি, চরিত্র, কর্মক্ষমতা কোনটাই দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযোগী নয়। এরা অনেকেই ভারতে এসে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বিপথেও যায়।

প্রতি বছর ভারত থেকে বহু য়ুরোপীয় অবসর গ্রহণ করে প্রচুর অর্থ নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যান। এই অর্থ ভারতের কোন কাজেই লাগে না। ভারতেই যদি তাঁদের এই মূলধন নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয় তাহলে তাঁরা সপরিবারে এখানেই বাস করবে। এবং তাঁদের অর্থ খাটবে এই দেশেই। তিনি বলেন, এতে দেশীয় সম্পদের বৃদ্ধি হবে।

রামমোহন জনস্বার্থে আর একটি মূল্যবান সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, কোনো আইনকানুন করবার পূর্বে জনমত গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। এটি গণতান্ত্রিক আদর্শ।

এসব ছাড়া রামমোহন আরও কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক করা, ফৌজদারী ও দেওয়ানী নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ করা এবং জুরি ও পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রচলন করতেও তিনি সুপারিশ করেন।

ধর্মচিন্তা

রামমোহনের মনে ধর্মজিজ্ঞাসা দেখা দেয় সম্ভবত বাল্যকালেই, পরিণত বয়সে নয়। পাটনা ও কাশীতে তিনি যখন আরবি ফার্সি সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করেন তখন তাঁর মনে জাগে তত্ত্বজিজ্ঞাসা। রংপুরে তাঁর ধর্মমত একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তার সূত্রপাত হয় এখানেই। কলকাতায় আসার পর তিনি যে ধর্মমত প্রচার করেন তার পেছনে ছিল এই প্রস্তুতিপর্ব।

রামমোহন নানা শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। হিন্দুধর্ম গ্রন্থে তো তাঁর ছিল গভীর ব্যুৎপত্তি, কোরান ও বাইবেলেও তাঁর জ্ঞান ছিল অসামান্য। সকল ধর্মকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, তাঁর কোন উক্তি বা রচনার মধ্যে কোন অবজ্ঞা বা কুৎসা প্রকাশ পায়নি। সকল ধর্মের প্রতি এই উদার মনোভাব রামমোহনের চরিত্রের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। ধর্মের মধ্যে যা অযৌক্তিক, যা অকল্যাণকর বলে তাঁর মনে হয়েছে, তা অবশ্য তিনি সমর্থন করেন নি, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আবার ধর্মের মধ্যে যা কল্যাণকর বলে মনে হয়েছে তা তিনি সমর্থন করতে বা গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। হিন্দু ইসলাম বা খৃষ্টধর্মের যা কিছু ভাল তা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করতেন।

গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে চণ্ডাল, পাষণ্ড, কালাপাহাড় বলে ধিক্কার দিয়েছে, তাঁকে হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করেছে, কিন্তু তিনি এসবে ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

রামমোহন ছিলেন খাঁটি হিন্দু। তিনি কোনদিন কোনখানে বলেন নি যে তিনি হিন্দু নন বা তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী। বিলাতে

তিনি বলেছিলেন, হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে যে অমূল্য সম্পদ আছে তা কোন য়ুরোপীয় শাস্ত্রে নেই। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি নির্দেশ দেন, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেন খৃষ্টানদের মতানুযায়ী না হয়। তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর শুভ্র উপবীতটি তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত দেহে ধারণ করে গেছেন।

রামমোহনের স্মরণীয় উক্তিটি উদ্ধৃত করি এখানে—"আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখনই হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয়।"

রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। উপনিষদের অদ্বিতীয় ব্রহ্মই—একমেবাদ্বিতীয়ং—তাঁর উপাস্য ছিলেন। সর্বশক্তিমান নিরাকার ব্রহ্মেরই তিনি ছিলেন উপাসক এবং তাঁর চিন্তা, কর্ম ও সাধনা এই ভিত্তি-ভূমির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই উপাসনার মধ্যে নেই কোন সাম্প্রদায়িকতা, নেই কোন অনুদার সংকীর্ণ মনোভাব। এর জন্য স্ত্রী পুত্র পরিবার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। সমাজে বাস করে সকল শ্রেণীর মানুষই পবিত্র মনে পরম ব্রহ্মের আরাধনা করতে পারে।

রামমোহনের ধর্মমত জানতে হলে পাঠ করতে হবে তাঁর রচিত ব্রহ্মসভা বা সমাজের ট্রাস্ট্ ডীড্ বা ন্যাসপত্র। এই নির্দেশনামাতে লিপিবদ্ধ আছে তাঁর ধর্মমতের সারকথা। অনেকেই বলেছেন, রামমোহনের পূর্বে তাঁর মতো বিশ্বজনীন ধর্মের কল্পনা কেউ করেনি, এমন উদার হৃদয় দিয়ে ধর্মকে কেউই দেখেনি এবং সকল ধর্ম সমন্বয় করবার মন্ত্রও কেউ উচ্চারণ করেনি।

তিনি ব্রহ্ম সভা স্থাপন করে যে ট্রাস্ট ডীড্ রচনা করেন তাতে নির্দেশ থাকে যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে উপাসনা করবার জন্য মিলিত হতে পারে। এ হচ্ছে সর্বজনীন মিলন কেন্দ্র। এখানে কিন্তু উপাসনা করতে হবে পরম পবিত্র মনে। আচরণ হবে শান্ত সংযত ও ভদ্র।

এখানে উপাসনা করতে হবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, অপরিবর্তনীয় পরমপুরুষকে, অন্য কাউকে নয়। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই, স্থান নেই কোন সম্প্রদায়ের দেবদেবীর বা অন্য কোন আরাধ্য ব্যক্তি বা বস্তুর।

কোনো প্রকার প্রতিমূর্তি—চিত্র, স্ট্যাচু বা খোদাই করা কোনো বস্তু উপাসনায় ব্যবহৃত হবে না। নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি কোনো সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান এখানে নিষিদ্ধ। কোনো প্রকার প্রাণী-হিংসা এই ধর্মসমাজে চলবে না। এমন কি পানাহার পর্যন্ত এখানে নিষিদ্ধ।

বক্তৃতায় বা সঙ্গীতে কোনো প্রাণী বা পদার্থ, কোনো মানুষ বা সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা চলবে না।

ট্রাস্ট ডীডে তিনি আরো নির্দেশ দিয়ে গেছেন—

"যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার উন্নতি হয়; প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয় এবং সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয় এখানে এই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে।"

বিশ্বের অসংখ্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ঐক্য নেই, আছে বিরোধ ও বিদ্বেষ। মানব-প্রেমিক রামমোহন সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। ধর্মকে সর্বজনীন ও অসম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছিলেন। এ এক অভিনব ধর্মচিন্তা, ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে সার্বভৌমিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস।

আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, "তিনি ভারতে একটি নূতন পন্থা স্থাপন করিতে চান নাই; ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা তাঁহার উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত। তিনি মানব-আত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহা সাময়িক, যাহা সাম্প্রদায়িক যাহা ব্যক্তিবিশেষেরই বিশেষত্ব—তাহা ধর্মের জীবন

হইতে পারে না, তাহা বন্ধন শৃঙ্খল মাত্র,—এই উদার বাণী নবযুগে তিনি প্রচার করিয়াছেন। এই বাণীই মানব-স্বত্বের প্রকৃত ঘোষণা-পত্র (Declaration of the Rights of Man), মানব-সমাজের সুখের, প্রকৃত শান্তির, সজীবতার, উন্নতির মূলমন্ত্র।"

শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, "ধর্মসংস্কারের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন তাহার ত কথাই নেই। ১৬ বৎসর বয়সের সময় যে পতাকা উড্ডীন করিলেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাহা উড্ডীন রাখিতে ক্রুটি করেন নাই। ইহাকেই তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কার্য করিয়াছিলেন। ইহার জন্য উপনিষদ অনুবাদ, ইহার জন্যই আত্মীয় সভা স্থাপন, ইহার জন্যই বাইবেলের অনুবাদ, ইহার জন্যই খ্রীষ্টীয় পাদরীদিগের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ, ইহার জন্যই খ্রীষ্টীয়দিগের প্রতি তিন নিবেদন, ইহার জন্যই ইউনিটেরিয়ান কমিটি গঠন, ইহার জন্যই অ্যাডাম সাহেবের উপাসনালয় স্থাপন, সেই অবশেষে ইহার জন্যই ১৮২৮ সালে ব্রহ্মসভা স্থাপন, তাহার গৃহনির্মাণ, সেই গৃহ ট্রষ্টীহস্তে অর্পণ, ও ১৮৩০ সালের জানুয়ারী মাসে তাহাতে ব্রহ্মোপাসন প্রতিষ্ঠা। কোনও কাজে হাত দিয়া তিনি আধখানা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই।"

রামমোহনের ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে হবে। আজকাল আমরা যে তুলনামূলক ধর্মের (Comparative Religion) কথা বলি তার প্রবর্তক রামমোহন। তাঁর পূর্বে ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা কেউই করেন নি। জার্মান মনীষী ম্যাক্সমুলার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "ধর্মসংস্কার বিষয়ে তিনি রামমোহনের শিষ্য বলে গর্ব অনুভব করেন এবং তুলনামূলক ধর্মালোচনার তিনিই জন্মদাতা।"

বিপিন চন্দ্র পাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইহারই ফলে পৃথিবীতে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ আজ সম্ভব হইয়াছে এবং ইহা বিশ্বমানবতার পথও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন

ধর্মের তুলনামূলক বিচার দ্বারা রামমোহন বিশ্বমৈত্রীর বেদী রচনা করিয়া গিয়াছেন—পৃথিবীর সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে মিলিবার ও মিলাইবার পথও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং রামমোহন সমগ্র বিশ্বেরই মুক্তিদূত।"

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "তাঁর সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু, জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে, বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।"

ইংলণ্ডে রামমোহন

য়ুরোপ ভ্রমণ করবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকেই পোষণ করছিলেন রামমোহন। স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য দেশের আচার-ব্যবহার, ধর্মজীবন ও রাজনৈতিক অবস্থা। ভারতের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ডে যাবার বিশেষ প্রয়োজনও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই সময়ে। সে সুযোগ আসে ১৮৩০ সালের শেষের দিকে।

এই সময় দিল্লীর বাদশাহ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি পেতেন। এই বৃত্তি বাড়িয়ে ১৮ লক্ষ টাকা করতে তিনি ইংলণ্ডের রাজার কাছে আবেদন করেন। কিন্তু শুধু আবেদন করলেই তো বৃত্তির বৃদ্ধি হয় না, এর জন্য তদ্বিরেরও প্রয়োজন হয়।

কিন্তু কে সাহায্য করবেন দিল্লীর এই হতশ্রী সম্রাটকে? রামমোহন ছিলেন সে সময়ের প্রখ্যাত ব্যক্তি, বিলাত যাবার জন্য তিনি তখন খুবই আগ্রহী। তাঁর পক্ষ সমর্থন করবার জন্য বাদশাহ তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে, তাঁর বিশেষ দূত হিসাবে পরিচয় দিয়ে বিলাতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেন। কোম্পানী কিন্তু রামমোহনের 'রাজা' উপাধি ও দৌত্যের অধিকার স্বীকার করল না। তা নাই করুক, রামমোহন স্থির করলেন সাধারণ মানুষ হিসাবেই তিনি বিলাত যাত্রা করবেন।

রামমোহনের বিলাত যাত্রার এটাই কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। এই সময়ে ভারতের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে এক সুদূর-প্রসারী সংস্কারের আয়োজন চলছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নতুন সনদ দিয়ে ভারতের শাসন প্রণালী সংস্কার করতে উদ্যত হয়েছিল বৃটিশ পার্লামেণ্ট। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর দেশের সর্বাঙ্গীন

উন্নতির জন্য পার্লামেণ্টের কাছে জানাবেন তাঁর অভিমত। এ ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। সহমরণ প্রথার পক্ষে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিরা তখন তুমুল আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। তাঁরা সহমরণ নিবারণ আইন রদ করবার জন্য বিলাতে আপিলও করেছিলেন। আপিলের শুনানীর উদ্যোগ আয়োজনও চলছিল সে সময়ে। বিলাতে গিয়ে এই আপিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলেন রামমোহন।

কালাপানি পার হয়ে রামমোহন সুদূর বিলাতে যাবেন, এ সংবাদ যখন প্রচারিত হল তখন আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে বাধা দিলেন। ম্লেচ্ছ দেশে গিয়ে জাতিচ্যুত হতে নিষেধ করলেন। তাঁর বিপক্ষীয়েরা নিন্দায় ও বিদ্রূপে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। গোঁড়া হিন্দুরা অভিশাপ দিতে লাগলেন। সমুদ্রযাত্রা তখন নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই রামমোহনের মত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বিলাত যাত্রা গর্হিত বলেই তাঁরা ধিক্কার দিলেন, অমার্জনীয় অপরাধ বলেই গণ্য করলেন।

রামমোহন এ সকল কটূক্তিতে কর্ণপাত করলেন না। সকল বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংলণ্ডে যান। কাজেই তাঁর বিলাতযাত্রা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সভ্যতার ইতিহাসেও এ এক স্মরণীয় দিক-চিহ্ন। এতদিন পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাই এসেছে প্রাচ্যে কিন্তু এখন রামমোহনই প্রথম সংযোগ ঘটালেন পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের। মিস্ কোলেট তাঁর বিলাতযাত্রা প্রসঙ্গে বলেছেন,…"a landmark in the general history of civilization. The West had long gone to the East, with him the East began to come to the West."

১৫ই নভেম্বর, ১৮৩০।

কলকাতা থেকে সুদূর ইংলণ্ডে যাত্রার দিন। সেদিন তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে বা অভিনন্দিত করতে হয়ত কোন আত্মীয়স্বজন আসেনি ভাগিরথীর তীরে। অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কেউ হয়ত পদার্পণ করেনি

তাঁর মানিকতলার বাড়িতে। প্রথমে তিনি স্টিমারে যান মেদিনীপুর জেলার খেজুরীতে, সেখান থেকে অ্যালবিয়ন জাহাজে চড়ে দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছান ইংলণ্ডে। যাত্রার পূর্বে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর পরম স্নেহভাজন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে করমর্দন করেন।

রামমোহন সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর পালিত পুত্র রাজারাম, এক পাচক রামরতন মুখোপাধ্যায়, এবং দু'জন ভৃত্য, রামহরি দাস ও শেখ বকস্থ। জাহাজে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন জেমস্ সাদারল্যাণ্ড (পরে যিনি হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হন), স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট (তাঁর একান্ত সচিব) এবং মণ্টগোমারি মার্টিন। সাদারল্যাণ্ড রামমোহনের সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, রামমোহন তাঁর নিজের কেবিনেই আহার করতেন। অধিকাংশ সময়ই কাটত তাঁর সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ করে। মধ্যাহ্নের পূর্বে ও সন্ধ্যার সময় পায়চারি করতেন ডেকের উপর। মন তাঁর সব সময়েই প্রফুল্ল থাকত। কখন কখনও নানা বিষয়ে আলোচনাও করতেন সহযাত্রীদের সঙ্গে। জাহাজের সকল লোকই তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখত, সব সময়েই তারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। সমুদ্রে যখন ঝড় উঠত, বিক্ষুব্ধ হত তরঙ্গ, তখন তিনি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখতেন দিগন্ত-প্রসারিত নীল জলরাশির তাণ্ডব আর তার গভীর গর্জন শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকতেন।

চার মাস তেইশ দিন পরে অ্যালবিয়ন জাহাজ নোঙর করল লিভারপুল বন্দরে। রামমোহন সহযাত্রীসহ উঠলেন এই সহরের র‍্যাডলির হোটেলে। আসার সঙ্গে সঙ্গেই লিভারপুলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে দেখতে, অভ্যর্থনা জানাতে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আসতে লাগলেন। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি ভারতের এই মহান আগন্তুকের সান্নিধ্যলাভের জন্য হোটেলে ভীড় জমতে থাকে। অনেকের সঙ্গেই সমাজ ধর্ম রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি আলোচনাও করেন।

লিভারপুলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনীষী উইলিয়ম্ রস্কোর সঙ্গে রামমোহনের সাক্ষাৎ—ভারত ও ইংলণ্ডের দুই মহান ব্যক্তির স্মরণীয় সাক্ষাৎ। রামমোহনের অনেক রচনার সঙ্গে রস্কোর পরিচয় ছিল আগে থেকেই, তাঁর কর্মসাধনার কথাও তাঁর অজানা ছিল না। রস্কো তখন অতিশয় বৃদ্ধ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু। রামমোহন তাঁর বাড়িতে গিয়ে ভারতীয় প্রথায় অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'যে মহাপুরুষের খ্যাতি শুধু য়ুরোপ কেন সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমি আজ খুবই সুখী, আজ আমি ধন্য হলাম।' রস্কো উত্তর দিলেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ, এই শুভ দিন দেখার সুযোগ পাব বলেই ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।' রামমোহন যাতে পার্লামেণ্টে প্রবেশের অধিকার পান তার জন্য লর্ড ব্রাউহামের কাছে অনুরোধ জানিয়ে রস্কো একটি পত্রও দেন তাঁর হাতে।

লিভারপুলে থাকার সময়েই রামমোহন সংবাদ পান পার্লামেণ্টে 'রিফর্ম বিল' সম্বন্ধে আলোচনা আসন্ন। তাই লণ্ডন যাবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ১৬ই এপ্রিল লিভারপুল ত্যাগ করে লণ্ডন যাত্রা করলেন। লিভারপুল ত্যাগ করবার পূর্বে একদিন ম্যানচেষ্টার সহরের কলকারখানাও দেখতে গেলেন। এখানে শ্রমজীবীরা দলে দলে আসতে লাগল তাঁকে দেখবার জন্য। সে কি প্রচণ্ড ভীড়! সেদিন ভীড় সামলাতে পুলিসের সাহায্য নিতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষকে।

১৮ই এপ্রিল, ১৮৩১।

মহানগরী লণ্ডনে এলেন রামমোহন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁর প্রতিভা এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য তাঁর বহুমুখী প্রচেষ্টার কথা জানতেন। তাঁর আসার সংবাদ পেয়েই অনেকেই আসতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে অ্যাডেল্‌ফি হোটেলে। মনীষী জেরেমি বেন্থাম এলেন গভীর রাত্রে। রামমোহন তখন নিদ্রামগ্ন। কাজেই

সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে বেন্থামের দেখা হল না। একটা কার্ডে তিনি লিখে রেখে গেলেন—'From Jeremy Bentham to his friend Rammohun Roy'. পরে অবশ্য এই দুই চিন্তানায়কের দেখা হয়েছিল, তাঁরা অনেক আলাপ আলোচনাও করেছিলেন। বেন্থাম রামমোহনকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামী পুরুষ বলেই অভিহিত করেন।

অ্যাডেল্‌ফি হোটেলে কিছুদিন থাকার পর রামমোহন এলেন রিজেন্ট স্ট্রীটের এক বাড়িতে। এখানেও দর্শনার্থীরা ভীড় করতে লাগল। লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এলেন দেখা করতে। রাজনৈতিক দলের নেতারাও এলেন। সাসেক্সের ডিউক ও ডিভনসায়ারের ডিউক আলাপ করে গেলেন তাঁর সঙ্গে। এখানে নিমন্ত্রণ, ওখানে সভা, এখানে আলোচনা, ওখানে আপ্যায়ন এমনি কর্মব্যস্ততার মধ্যেই দিন কাটতে লাগল রামমোহনের। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরও তাঁর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল তাঁর, রাজা তাঁকে সমাদরেই অভ্যর্থনা করলেন। রাজার অভিষেকের সময় বিদেশীয় দূতদের ন্যায় তিনিও সমান মর্যাদা লাভ করলেন।

রিজেন্ট স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে রামমোহন এলেন বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ারে। এখানে বাস করতেন তাঁর হিতৈষী বন্ধু ডেভিড হেয়ারের ভাইয়েরা। এঁদের বাড়িতেই এলেন তিনি। কলকাতা থেকে ডেভিড হেয়ার তাঁর ভাইদের আগেই জানিয়েছিলেন রামমোহনের লণ্ডনে থাকার সময় তাঁর সুখ-স্বাচ্ছ্যন্দের দিকে লক্ষ্য রাখতে। তাঁরা সে অনুরোধ ভালভাবেই রক্ষা করেছিলেন।

১৮৩২ সালের শরৎকালে রামমোহন গেলেন ফ্রান্সে। যাবার আগে ফরাসী ভাষা শিখে নিলেন অল্প সময়ের মধ্যে। সঙ্গে গেলেন ডেভিড হেয়ারের এক ভাই। ফ্রান্সে প্রবেশ করবার পূর্বে তো পাশপোর্ট চাই, তার জন্য আবেদন করলেন ফরাসী গভর্নমেণ্টের

কাছে। এই আবেদনপত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এখানে জাতি ধর্মনির্বিশেষে মানুষের ঐক্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। একটি জাতিসঙ্ঘ গঠনের পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। রামমোহনের পূর্বে জাতিসঙ্ঘ গঠনের কথা কেউই বলেন নি। ফ্রান্সেও তিনি প্রচুর সমাদর পান। ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। ফ্রান্সেই কবি মুরের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা চলে।

ফ্রান্সে বেশি দিন থাকা চলল না রামমোহনের, ফিরতে হল লণ্ডনে। পার্লামেন্টে তখন রিফর্ম বিল সম্পর্কে আলোচনা চলছে। তাই দিনের পর দিন তিনি এই সভাগৃহে উপস্থিত থেকে আলোচনার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করতেন। কারণ ভারতের ভাবী শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। তাঁর অবসর ছিল না এ সময়ে।

লণ্ডনে পাদ্রী ডেভিডসনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কি আশ্চর্য, ডেভিডসন তাঁর এক পুত্রের নামকরণ করেন 'রামমোহন।' ভারত-হিতৈষী কুমারী কার্পেণ্টারের পিতা ল্যাণ্ট কার্পেণ্টারের সঙ্গেও রামমোহনের বন্ধুত্ব জন্মায়। তিনি কুমারী ক্যাসেল ও কুমারী ফিডেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা রামমোহনকে লণ্ডন নগরীর কোলাহল থেকে বৃস্টলের শান্ত পরিবেশের মধ্যে বাস করতে অনুরোধ করেন।

এই সময়ের কর্মব্যস্ততার মধ্যেই একটি চিঠি লেখেন রামমোহন কুমারী ক্যাসেলকে, "আজ কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কে পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হবে। কমিটিতে নানাপ্রকার ছল করে সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর তর্ক-বির্তক চালিয়ে আসল কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে। কমন্স সভায় এই পাণ্ডুলিপি পাশ হলে লর্ড সভায় কি হবে তা নির্ধারণ করতে আমার দেরী হবে না। তখন আমি এর শেষ ফল শুনবার জন্য প্রতীক্ষা না করে লণ্ডন ত্যাগ করব। পরের সপ্তাহে আমি ব্রিস্টল রওনা হব।'

বৃস্টলে মহাপ্রয়াণ

বৃস্টলের স্টেপলটন্ গ্রোভ্, কুমারী ক্যাসেলের বাড়ি। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে কুমারী হেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রামমোহন এলেন এখানে মহানগরী লণ্ডনের কোলাহল থেকে নিস্তার পাবার জন্য। এখানে পেলেন সহৃদয় আতিথ্য। ডাঃ কার্পেণ্টার ছিলেন কুমারী ক্যাসেলের অভিভাবক। তিনি এই শ্রদ্ধেয় অতিথির সঙ্গে প্রায়ই মিলিত হতেন, নানা বিষয় আলোচনা করতেন। আর কুমারী ক্যাসেলের তো কথাই নেই। তিনি তাঁর সুখ ও স্বাচ্ছ্যন্দের দিকে সব সময়েই লক্ষ্য রাখতেন।

বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রামমোহনের। কিন্তু এখানে অবসর কোথায়? নানা জনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হয় এখানেও। ইংরেজ প্রবন্ধকার জন ফস্টার আসেন দেখা করতে, নানা প্রশ্ন নিয়ে তিনিও আলোচনা করেন তাঁর সঙ্গে।

ইউনিটেরিয়ানদের উপাসনালয়েও তিনি যান মাঝে মাঝে। বৃস্টল সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একদিন এক সভা আহ্বান করেন। এখানে শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁরা নানা প্রশ্ন করেন রামমোহনকে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েই এই সব প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সেদিন মুগ্ধ ও বিস্মিত হন প্রশ্নকর্তারা।

এই সময়ে রামমোহনের মনে শান্তি ছিল না। নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েছিলেন তিনি। লণ্ডন সহরে তাঁকে ব্যয়বহুল জীবন যাপন করতে হয়। কলকাতায় যাঁদের সঙ্গে টাকা পাঠাবার জন্য বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন তাঁরা টাকা পাঠাতে পারেন নি। ফলে তাঁকে বিদেশে খুবই বিপন্ন হতে হয়।

১৯শে সেপ্টেম্বর রামমোহন জ্বরে আক্রান্ত হন। ডঃ এস্টলিন ঔষধ দেন, কিন্তু জ্বর বাড়তেই থাকে। ডঃ পিচার্ড ও ডঃ ক্যারিককে ডাকা হয়, কিন্তু তাঁদের চিকিৎসাতেও রোগীর অবস্থার উন্নতি হয় না। নাড়ী ক্রমেই ক্ষীণ হতে থাকে, নিশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়, মস্তিষ্কের প্রদাহ দেখা দেয়। কুমারী হেয়ার সেবা শুশ্রূষা করেন, ডাক্তারেরা নিয়মিত আসেন, জন হেয়ার আর কুমারী ক্যাসেল রোগীর পাশে পাশেই থাকেন কিন্তু কিছুতেই আর রোগের উপশম হয় না।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩।

চরম সংকট দেখা দেয় এই দিন। প্রতি মুহূর্তেই অবস্থা খারাপ হতে থাকে রামমোহনের। শ্বাস প্রশ্বাস বিঘ্নিত হয়। নাড়ী ক্ষীণতর হয়ে আসে, কখনও বা অনুভব করাই যায় না। ক্রমাগতই তিনি ডান হাত নাড়তে থাকেন। বেশীর ভাগ সময়ই যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন।

সেদিনের রাত্রি ছিল চন্দ্রালোকিত। কুমারী হেয়ার, কুমারী কিডেল ও ডঃ এলিসন জানালা দিয়ে দেখলেন নিশীথ রাতের গ্রাম্য দৃশ্য। একদিকে এই মনোরম দৃশ্য, অন্য দিকে ভারতের এক বিরাট পুরুষ শয্যাগত। তাঁর জীবনদীপ ধীরে ধীরে নির্বাপিত হচ্ছে। কুমারী হেয়ার শোকে ভেঙে পড়লেন, পাশের একটা চেয়ারে বসে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। বালক রাজারাম রোগীর হাত ধরে রয়েছেন। রামরতন হাঁটু গেড়ে তাঁর পাশে বসেছেন চিবুক ধরে। কাছে ছিলেন আরও কয়েকজন, জন হেয়ার, কুমারী ক্যাসেল, এলিসনের মা, রামহরি। সকলেই নীরব, সকলেই বিষণ্ণ। রামরতন সংস্কৃত ভাষায় প্রার্থনা করলেন।

গভীর উৎকণ্ঠায় কাটে আরোও কয়েকটি মুহূর্ত। সকলেই অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে থাকে রোগীর পাণ্ডুর মুখের দিকে। রাত্রি তখন ২টা বেজে ২৫ মিনিট। রামমোহন তাঁর অতি প্রিয় মন্ত্র ওঁম উচ্চারণ করলেন আর তারপরই সব শেষ। ভারতের এক

মহাপুরুষ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন বৃস্টল সহরে। স্বাধীনতার পূজারী রামমোহন, যুগপ্রবর্তক রামমোহন সুদূর ইংলণ্ডে মহাপ্রয়াণ করলেন।

মৃত্যুর পূর্বে রামমোহন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর মৃতদেহ যেন খৃস্টানদের সমাধিক্ষেত্রে বা তাদের ধর্মীয় রীতি অনুসারে সমাধিস্থ করা না হয়। তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধুরা তাঁর সে নির্দেশ পালন করেছিলেন। স্টেপলটন গ্রোভের কাছেই এক নির্জন কুঞ্জের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেদিন ছিল ১৮৩৩ সালের ১৮ই অক্টোবর।

বছর দশেক পর দ্বারকানাথ ঠাকুর গেলেন বিলাতে। তাঁর দেশবাসী তাঁকে নির্দেশ দেন রামমোহনের সমাধির উপর যোগ্য সমাধিসৌধ নির্মাণ করতে। রামমোহনের মৃতদেহ তিনি এখান থেকে স্থানান্তরিত করলেন বৃস্টলেরই উপকণ্ঠে 'আরনোস্ ভেল'-এ। এখানেই তিনি সমাধিসৌধ নির্মাণ করে দিলেন হিন্দু মন্দিরের আকারে।

বৃস্টলের এই সমাধি মন্দির ভারতীয়দের তীর্থস্থান।

রামমোহনের মৃত্যুর পর কলকাতার টাউন হলে প্রথম স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি স্যার জন পিটার গ্র্যান্ট। এই সভায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রামমোহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কার্যাবলীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি কমিটিও গঠন করেন।

চরিত কথা

রামমোহন ছিলেন শক্তিমান পুরুষ। তাঁর দেহ ছিল সুঠাম ও বলিষ্ঠ, উচ্চতায় ছ'ফুটের কম নয়। উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষস্থল, দীপ্তিময় চোখ, এবং প্রাচীন রোমানদের মত নাক,—এই ছিল তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য। দেশ বিদেশের অনেকেই এই সুদর্শন প্রতিভা-দীপ্ত পুরুষকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

তাঁর আহার করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কথিত আছে, তিনি একদিনে ১২ সের দুধ পান করতে পারতেন, এবং একবারেই গোটা একটা পাঁঠার মাংস উদরসাৎ করতে পারতেন। একদিন তাঁর এক বন্ধু খবর দিল, তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। এতে কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। শুধু গর্জে উঠলেন, আমাকে মারবে কে? কলকাতার লোক আমাকে হত্যা করবে? তারা খায় কি? রামমোহন ছিলেন পুরুষসিংহ।

বিদ্যাসাগর লিখেছেন, রামমোহন আয়ত্ত করেছিলেন দশটি ভাষা —সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী, হিব্রু, গ্রীক, ফরাসী এবং ল্যাটিন। যে যুগে মুদ্রিত গ্রন্থ ও অভিধান দুর্লভ ছিল, যখন আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার কথা কেউই ভাবত না, সেই সময়ে তিনি কি করে শিখেছিলেন এতোগুলি ভাষা তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। তিনি এমনভাবে কোরাণ পাঠ করেছিলেন যে মুসলমানেরা তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলবী' বলতেন। আর বাইবেল পাঠ তো মূল হিব্রু ও গ্রীক ভাষার মাধ্যমেই করেছিলেন।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল তাঁর ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি। ইংরেজীতে লেখা চিঠিপত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের স্বাক্ষর আছে। একাধিক ইংরেজ তাঁর বিশুদ্ধ ইংরেজী রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অথচ আশ্চর্যের কথা, বাল্যকালে তিনি ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভই করেন নি। ইংরেজী ভাষায় তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। শুধু ভাষা শিক্ষা নয়, তিনি বিভিন্ন ভাষায় রচিত নানা সাহিত্য, দর্শন, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতিও পাঠ করেছিলেন গভীরভাবে। রামমোহনের ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর।

তখন গ্রীষ্মকাল। রামমোহন এলেন অ্যাডাম সাহেবের বাড়ি। মুখে চোখে তাঁর উত্তেজনার চিহ্ন। একটু জল খেয়ে সুস্থ হয়ে অ্যাডামকে বললেন, আজ আমি জীবনের চরম আঘাত ও দুঃখ পেয়েছি। অ্যাডাম জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কি। রামমোহন বললেন, বিশপ মিডলটন আমাকে লোভ দেখিয়ে বলেছে, আমি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে সমাজে আমার সম্মান বাড়বে, প্রতিপত্তি বাড়বে। লোকটা আমাকে লোভ দেখিয়েছে। ছি! ছি! আমাকে এত ছোটলোক মনে করে! অ্যাডাম বলেছেন, রামমোহন জীবনে আর কখনও মিডলটনের সঙ্গে দেখা করেন নি। রামমোহনের আত্মসম্মান-বোধ ছিল অত্যন্ত গভীর। সকল প্রকার নীচতাকে তিনি ঘৃণা করতেন অন্তর দিয়ে।

কর্মে ও চিন্তায় রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী। তখন তিনি ইংলণ্ডে। এই সময়ে পার্লামেন্টে 'রিফর্ম বিল' নিয়ে আলোচনা চলছে। এই বিল পাশ হলে ভারতের কিছু কল্যাণ হতে পারে। তাই অধীর আগ্রহে তিনি লক্ষ্য করছেন আলোচনা। একদিন প্রকাশ্যেই তিনি বলেছিলেন, এই আইন পাশ না হলে আমি ইংলণ্ডের অধীনে আর থাকব না, সব সম্পত্তি বিক্রি করে ভারত ছেড়ে চলে যাব

আমেরিকায় যেখানে আছে স্বাধীনতা। অ্যাডাম সাহেব এক বক্তৃতায় বলেন, "He would be free or not be at all. Love of freedom was perhaps the strongest passion of his soul—freedom not of action merely, but of thought".

১লা জানুয়ারী, ১৮০৯।

রামমোহন পৌঁছলেন ভাগলপুরে। এই দিনই কালেক্টর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের সঙ্গে তাঁর ঘটে যায় একটা সংঘর্ষ। রামমোহন যাচ্ছিলেন পাল্কীতে। হ্যামিল্টন তখন দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তার ধারে এক ইটের পাঁজার উপরে। তাঁর চোখে পড়ল একজন ভারতীয় চাপরাশী বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে পাল্কী চড়ে তাঁর সামনে দিয়েই যাচ্ছেন। তা দেখেই তো তিনি রেগে আগুন। চিৎকার করে রামমোহনকে পাল্কী থেকে নামতে আদেশ করলেন। এতে কিন্তু কোন ফল হল না, রামমোহন পাল্কী থেকে নামলেন না। পাল্কী থামছে না দেখে সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন তাঁর কাছে, আটকালেন পাল্কীকে।

রামমোহন পাল্কী থেকে নামলেন এবং ভদ্রভাবেই নমস্কার করলেন। কিন্তু শিষ্টাচারের বিনিময়ে সাহেব গর্জে উঠলেন, গালাগালি দিতে লাগলেন। রামমোহন তখন হ্যামিল্টনের ইতর কথায় কর্ণপাত না করে বীরদর্পেই পাল্কীতে চড়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

কালেক্টর হ্যামিল্টনের এই উদ্ধত ও অশালীন আচরণ রামমোহন বরদাস্ত করেন নি। কিছুদিন পরে বড়লাট মিণ্টোর কাছে এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে এক আবেদন পাঠালেন। এই অপমানের প্রতিকার চাইলেন। চিঠিটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

রামমোহনের আবেদন একেবারেই ব্যর্থ হয়নি। এর ফলে আদেশ হয়েছিল, ভবিষ্যতে হ্যামিল্টন সাহেব যেন দেশীয় লোকের সঙ্গে ঐরূপ বচসা না করেন।

ভাগলপুরের এই ঘটনাটি রামমোহনের পৌরুষ ও আত্মসম্মান-বোধের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

সতীদাহ প্রথা আইনের সাহায্যে নিষিদ্ধ হয়েছে। রামমোহন আর তাঁর সহযোগীরা উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে টাউন হলে অভিনন্দিত করেছেন। অভিনন্দনপত্র লিখেছেন রামমোহন সুন্দর ইংরেজীতে। এই সময় রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র। একদিন তাঁরা কলেজের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, অভিনন্দনপত্রের রচয়িতা কে—রামমোহন না অ্যাডাম সাহেব? ঠিক এই সময়েই ডিরোজিও ঢুকলেন ঘরে। শুনলেন তাঁদের তর্কের বিষয়। তিনি তখন ছাত্রদের বললেন, "তোমরা মানুষ, না এই দেয়াল? নারীহত্যারূপ ভীষণ প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা কোথায় আনন্দ করিবে, না অভিনন্দনপত্রের ইংরাজী কাহার রচনা এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত! রামমোহন রায় ইংরাজীতে কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি জানিলে তোমরা উহা অ্যাডাম সাহেবের বলিয়া মনে করিতে না।"

রামমোহনের অধ্যয়ন-স্পৃহা ও স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। কথিত আছে তিনি একদিন একাসনে বসে সমগ্র সংস্কৃত বাল্মিকী রামায়ণ পাঠ করেছিলেন। আর একদিনের কথা বলি। তন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতে এক পণ্ডিত এলেন রামমোহনের কাছে। কিন্তু সেই তন্ত্রগ্রন্থটি তাঁর পড়া ছিল না। বইটা তাঁর সংগ্রহেও ছিল না। তাই তিনি পরের দিন পণ্ডিতকে আসতে বললেন। ইতিমধ্যে শোভাবাজারের রাজবাটী থেকে বইটি সংগ্রহ করে পাঠ করে ফেললেন রাত্রি জেগে। পরের দিন পণ্ডিত এলে তাঁর সঙ্গে রীতিমত শাস্ত্র বিচার

আরম্ভ করলেন। সেদিন রামমোহনের কাছে পণ্ডিতকে হার মানতে হয়েছিল।

গঙ্গার তীরে এসেছেন এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি হবেন সহমৃতা। সংবাদ পেয়েই রামমোহন চললেন সেখানে। আত্মীয়স্বজনদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন তারা যাতে নিবৃত্ত হয় সতীদাহ করা থেকে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কেউ বোঝে না, কেউ শোনে না তাঁর কথা। একজন তো অগ্নিশর্মা হয়েই উঠল। বললে, এ হচ্ছে হিন্দুর কাজ, এখানে মুসলমান কেন? রামমোহন এতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হলেন না। কিন্তু যে ভৃত্যটি তাঁর সঙ্গে ছিল সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। হয়ত একটা দাঙ্গা বাধিয়েই ফেলত সে। রামমোহন তাকে প্রতিবাদ না করতে নির্দেশ দিলেন। উত্তেজনার মুহূর্তেও রামমোহন কখনও তাঁর ধৈর্য হারাতেন না। জীবনে অনেক আঘাত তিনি সহ্য করেছেন অবিচলিত চিত্তে।

রাধানগরের তালপুকুর ছিল সেকালের এক বৃহৎ সরোবর। কয়েক ক্রোশের মধ্যে এত বড় জলাশয় ছিল না কোথাও। গ্রীষ্মের সময় দূর-দূরান্ত থেকে আসত অনেক স্ত্রীলোক এই পুকুর থেকে জল নিয়ে যেতে। কখনও কখনও তাদের মাটির কলসী যেতো ভেঙে। তারা তখন চোখের জল ফেলে খালি হাতেই ফিরত বাড়ি। দুঃখের সীমা থাকত না তাদের। শোনা যায়, রামমোহন এদের দুঃখ দেখে বিচলিত হন। তিনি তালপুকুরের কাছেই একটা ঘরে প্রচুর কলসী কিনে জমা করে রাখেন। যার কলসী ভেঙে যেতো সে এখান থেকে কলসী নিয়ে জল ভর্তি করে বাড়ি ফিরত।

আর একটি কাহিনীও বলা যাক এখানে। একদিন চোগা চাপ-কান পরে কোন জরুরী কাজে চলেছেন রামমোহন। চোখে পড়ল

রাস্তার ধারে বসে আছে এক বৃদ্ধ, পাশে রয়েছে মস্ত বড় একটা মোট। এত ক্লান্ত যে সে মোটটা কিছুতেই তুলতে পারছে না তার কাঁধে। কোন পথচারী তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি সেদিন। রামমোহনই মোটটি তুলে দিয়েছিলেন তাঁর কাঁধে।

নিজের গ্রামে একটা হাট বসিয়েছিলেন রামমোহন। তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ নাকি জোর জুলুম করে সকলের কাছ থেকেই 'তোলা' আদায় করতেন। রামমোহন যখন গ্রামে এলেন তখন বিক্রেতারা তাঁর কাছে অভিযোগ করল। তিনি রাধাপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন এবং বুঝিয়ে বললেন, যারা অত্যন্ত গরীব, যারা সামান্য জিনিসপত্র বিক্রি করতে হাটে আসে তাদের কাছ থেকে জোর করে কিছু আদায় করা খুবই অন্যায়। এ অন্যায় বন্ধ করতেই হবে। এর পর থেকেই তোলা আদায় করা বন্ধ হয়ে যায়।

টাকীর জমিদার কালীনাথ মুন্সীর সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুত্ব ছিল। একদিন এক ব্যক্তি কালীনাথের কাছে একটা শাঁখ বিক্রি করতে আসে। সে বলে, ঐ শঙ্খ যার বাড়িতে থাকবে তার ধনরত্নের অভাব হবে না। এর দাম পাঁচশো টাকা। কালীনাথ তার কথায় বিশ্বাস করে শাঁখটা কিনতেই চাইলেন। কিন্তু কেনার আগে রামমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করতে তাঁর বাড়ি গেলেন। রামমোহন শুনলেন শাঁখের কথা। বুঝতে দেরী হল না আসল ব্যাপারটা কি। কালীনাথকে বললেন, পাঁচ শো টাকায় যদি লক্ষ্মীকে ঘরে বাঁধা যায় তাহলে সে তো খুব সুখের বিষয়, কিন্তু বিক্রেতা এমন একটি শুভ জিনিসকে তার ঘরে না রেখে কয়েকশো টাকায় বিক্রি করতে চাইছে কেন? রামমোহনের কথায় কালীনাথের ভুল ভাঙল। শঙ্খ বিক্রেতাকে তিনি বিদায় করে দিলেন।

এমনি অনেকেই আসতেন রামমোহনের সংগে পরামর্শ করতে। কেউ আসত সমাজ ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে, কেউ আসত আইনের জটিল প্রশ্ন নিয়ে, কেউ বা আসত ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। সকলের সঙ্গেই রামমোহন মিলিত হতেন হৃদ্য পরিবেশে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্র ছিলেন রমাপ্রসাদ ছিলেন তাঁর সহপাঠী। শনিবার ছুটির পর তিনি রমাপ্রসাদের সঙ্গে প্রায়ই রামমোহনের বাড়ি যেতেন। এই বাড়ির ভেতর একটা বাগান ছিল। এখানে ছিল একটা দোলনা। রামমোহন কিছুক্ষণ তাঁকে দোলনায় দুলিয়ে পরে নিজেই দুলতেন। একদিন এক পণ্ডিত এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেখলেন, রামমোহন দোলায় দুলছেন। তিনি তো অবাক, এতবড় লোক ছেলেদের মতো দোলনায় দুলছেন। তিনি বললেন, একি করছেন? পরিহাসের সুরে রামমোহন উত্তর দিলেন, বিলাত যাবার খুব ইচ্ছে আছে কিনা আমার। শুনেছি সমুদ্রে যখন ঝড় ওঠে তখন জাহাজ দোল খায়, আর তার ফলে যাত্রীদের সমুদ্র-পীড়া হয়। জাহাজে চেপেই বিলাত যাব কিনা, তাই এখন থেকেই তৈরি হচ্ছি।

রামমোহনের বাড়িতে বালক দেবেন্দ্রনাথের ছিল অবারিত দ্বার। কখনো কখনো আহারের সময়ও এসে পড়তেন তিনি। একদিন সকালে মধু দিয়ে রুটি খাচ্ছেন এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে। রামমোহন তাঁকে বললেন, 'বেরাদার, এই দেখ, আমি মধু ও রুটি খাচ্ছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করে থাকি।' 'বেরাদার' মানে ভাই। অন্তরঙ্গদের তিনি প্রায়ই এই মধুর সম্ভাষণ করতেন।

উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক একদিন রামমোহনের কাছে তাঁর এডিকংকে পাঠালেন। সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই

রামমোহনের সঙ্গে তাঁর দেখা করার প্রয়োজন হয়। রাজা এডিকংকে (Aid-de-camp) বললেন, 'আমি এখন শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মানুশীলনে খুবই ব্যস্ত আছি, বৈষয়িক ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অবসর নেই। আপনি অনুগ্রহ করে লাটসাহেবকে জানাবেন, আমার রাজদরবারে উপস্থিত হবার ইচ্ছা নেই।'

এডিকং রামমোহনের কথাগুলো সঠিকভাবেই বেণ্টিঙ্ক সাহেবকে জানালেন। বেণ্টিঙ্ক তখন তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি মিঃ রামমোহন রায়কে কি বলেছিলেন?'

এডিকং উত্তর দেন, 'আমি মিঃ রামমোহন রায়কে বলেছিলাম, গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বেণ্টিঙ্ক তখন তাঁকে বলেন, 'আপনি আবার তাঁর কাছে যান এবং বলুন যে মিঃ উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে আপনি যদি অনুগ্রহ করে একবার দেখা করেন তাহলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হবেন।'

এডিকং আবার এলেন রামমোহনের কাছে। বেণ্টিঙ্কের নির্দেশমত অনুরোধ জানালেন। রামমোহন এবার লাটসাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা করলেন না, গেলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সতীদাহ প্রথা রদ করবার জন্যই তিনি সেদিন বেণ্টিঙ্ককে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু ছিলেন রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি একদিন রামমোহনকে জানালেন, 'আপনি বেণ্টিঙ্ক সাহেবকে অভিনন্দনপত্র দিয়েছেন শুনে রাধাকান্ত দেব ভীষণ চটে গিয়েছেন।'

রামমোহন বললেন, 'বল কি? বেণ্টিঙ্ক সাহেব এমন একটা মহৎ কাজ করলেন আর তাঁকে অভিনন্দন জানাব না?'

হরিহর দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁরা নাকি সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন?'

রামমোহন উত্তর দেন, 'হ্যাঁ তাই করেছেন, প্রিভি কাউন্সিলে অবশ্য এর শুনানী হবে।'

কালীনাথ মুন্সী তখন প্রশ্ন করেন, 'তাহলে আমরা কি করব?'

রামমোহন উত্তর দেন, 'কেন, সংগ্রাম করব, আমি তো খুব শীগগির ইংলণ্ড যাচ্ছি।'

গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ছিলেন রামমোহনের ভাগিনেয় এবং তাঁর অতি প্রিয়পাত্র। এক সময় কোন লোক রামমোহনকে হেয় করবার জন্য এক অশ্লীল গান রচনা করে। গানটার একটু অংশ এই:

"জেতের নিকেস, রামমোহন রায়, বিদ্যের নিকেস করেছে;
হদ্দ এক নিকেসের ফর্দ উঠেছে।"

গুরুদাস কোনরূপ অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না, তাই তিনি এই গীত-রচয়িতাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। রামমোহন যখন তাঁর ভাগনের মতলব জানতে পারলেন তখন তাঁকে ডেকে বললেন, 'লোকে অনেক কথাই বলে, তাদের কথায় কান দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যে যাই বলুক না কেন আমরা অভীষ্ট পথ থেকে কখনই বিচ্যুত হব না।'

রামমোহনের বয়স তখন হয়তো ষোল কি সতের। অনেকেই বলেছেন, এই বয়সেই তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবার জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। পথ ছিল দুর্গম, দেশ ছিল অপরিচিত এবং ভাষা ছিল অজানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামমোহন গিয়েছিলেন লামাদের এই দেশে।

তিব্বতে কিন্তু রামমোহনকে বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তিব্বতের লামা বৌদ্ধ পুরোহিত, তাঁর দেশবাসীর পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। লামাকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেই পূজা করত

তারা। রামমোহন কিন্তু এরূপ মনোভাবের বিরোধিতা করেন। তিনি তাদের এই ধর্মমতের প্রতিবাদ করেন।

এর ফলে তিব্বতীয়েরা ক্ষেপে উঠে। তারা রামমোহনের জীবন-নাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ঠিক এই সময়েই তিব্বতের কয়েকজন রমণী তাঁর জীবন রক্ষা করে। তারা সাহায্য না করলে ঐ দূর দেশে তাঁকে দেহরক্ষা করতে হত। তিব্বতীয় নারীদের সহৃদয় ব্যবহার রামমোহনের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কুমারী কার্পেণ্টার এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "তিনি নিজে বলিয়াছিলেন যে, তিব্বতবাসী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।"

বাল্যকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। জীবনের নানা চিন্তা ও কর্মে তিনি ছিলেন রামমোহনের উত্তরসাধক। তিনি লিখেছেন ঃ

"রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। প্রায় প্রতি শনিবারে বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে পর আমি রমাপ্রসাদের সহিত রাজাকে দেখিতে যাইতাম। রাজার উদ্যানে একটি বৃক্ষের শাখায় একটি দোলনা ছিল। রমাপ্রসাদ ও আমি উহাতে দুলিতাম। কখনও কখনও রাজা আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন। আমাকে কিছুক্ষণ দোলাইয়া, তিনি দোলনার উপর উঠিয়া বসিতেন এবং আমাকে দোল দিতে বলিতেন।

"রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার কাছে যাইতে পারিতাম। কখনও কখনও পূর্বাহ্ণে তাঁহার আহারের সময় যাইতাম। তিনি সচরাচর উক্ত সময়ে মধু দিয়া রুটি খাইতেন। ...কোন কোন দিন আমি রাজার স্নানের সময়ে তাঁহার বাটীতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। তিনি স্নানের পূর্বে

সমস্ত শরীরে অধিক সর্ষপ তৈল মর্দন করিতেন। তাঁহার শরীরে তেল গড়াইয়া পড়িত।

"তিনি বলবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশীসকল শক্ত ছিল। তৈলমর্দিত অনাবৃত দেহে কটিদেশের চতুষ্পার্শে একখণ্ড বস্ত্র মাত্র, তাঁহার এই প্রকার মূর্তি দেখিয়া বালক বলিয়া আমার মনে ভীতির সঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্বক পদনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি এই সকল ভাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় ভাবের সহিত যে সকল কবিতা আবৃত্তি করিতেন, আমি তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। আমার এখন বোধ হয় উহাই রাজার উপাসনা ছিল।

"রাজার পালিত পুত্র রাজারাম বড় দুষ্ট ছিল। রাজার সহিত অনেক প্রকার দুষ্টামি করিত। কিন্তু রাজা কিছুতেই তাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন না। বাস্তবিক আমি এ পর্যন্ত যত লোক দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় সুমিষ্ট মেজাজের লোক দেখি নাই।...

"রাজা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অল্প বয়সে দেশের প্রচলিত ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রাজার সহিত আলাপ হওয়াতে প্রচলিত ধর্মে তাঁহার অবিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজা যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।...

"রাজার এমন এক শক্তি ছিল যদ্দারা তিনি সকলপ্রকার লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, সুতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের

এমন এক আকর্ষণ ছিল যে, আমি আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেরূপ আকৃষ্ট হই নাই।...

"যখন রামমোহন রায়ের মৃত্যু সংবাদ আসিল তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। আমি তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।"

রামমোহনের আত্মকথা

[১৮৩০ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতার বন্ধু গর্ডন সাহেবকে লেখা রামমোহনের চিঠি। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ]

'আমার পূর্বপুরুষেরা উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক ধর্ম সম্বন্ধীয় কর্তব্যসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য পরিত্যাগ কয়িয়া বৈষয়িক কার্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ্দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে, কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, কখন বা পতন। কখন ধনী, কখন নির্ধন, কখন সাফল্যলাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্মানুসারে ধর্মযাজক ব্যবসায়ী এবং উক্ত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবারের ন্যায় উচ্চতর পদবীর আর কেহই ছিলেন না। তাঁহারা বর্তমান সময় পর্যন্ত সমভাবে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচিন্তাতে অনুরক্ত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান কারিয়া আসিয়াছেন।

'আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান রাজসরকারে কার্য করিতে হইলে উক্ত দুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই। হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্মশাস্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত।

'ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশত আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ক্রম বিংশতি বৎসর হইলে আমার পিতা আমাকে পুনর্বার আহ্বান করিলেন। আমি পুনর্বার তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোপীয়-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে একপ্রকার জ্ঞানলাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণত অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহাদিগের শাসন বিদেশীয় শাসন হইলেও, উহা দ্বারা শীঘ্র দেশ-বাসিগণের অবস্থার উন্নতি হইবে। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসভাজন ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং তাঁহাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি পুনর্বার

বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পথ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রণযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, দুই তিন জন স্কটল্যাণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতির অন্তর্গত তাঁহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ।

'আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগের পূর্ব পুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও তদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান তাহার মতবিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ স্বত্বেও, আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

'এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা হইল। যাহা হউক, যে পর্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশাসন ও ভারতবাসিগণের প্রতি গভর্নমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে ও

সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌউন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্মচারীদের নিকট আবেদন করিবার জন্য, তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন। আমি তদনুসারে ১৮৩০ সালের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হই।'

বংশ তালিকা

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রায় রায়ান) ছিলেন রামমোহনের প্রপিতামহ। নিবাস ছিল তাঁর মুর্শিদাবাদের শাকাসা গ্রামে। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন পরশুরামের পৌত্র।

কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র—অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ।

ব্রজবিনোদের সাত পুত্র—নিমানন্দ, রামকিশোর, রাধামোহন, গোপীমোহন, রামকান্ত, রামরাম ও বিষ্ণুরাম।

রামকান্তের তিন পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র : জগমোহন, রামমোহন, রামলোচন।

রামকান্তের তিন স্ত্রী : সুভদ্রা দেবী (নিঃসন্তান), তারিণী দেবী ও রাসমণি দেবী। তারিণী দেবীর পুত্র জগমোহন ও রামমোহন। রাসমণি দেবীর পুত্র রামলোচন। রামকান্তের কন্যার বিবাহ হয় শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এঁর পুত্রের নাম গুরুদাস মুখোপাধ্যায়।

রামমোহনের দুই পুত্র : রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ।

রামমোহনের তিন স্ত্রী—প্রথম স্ত্রী মারা যান অতি অল্প বয়সে, দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম শ্রীমতী দেবী, মারা যান ১৮২৪ সালে। তৃতীয় স্ত্রী : উমা দেবী (নিঃসন্তান) মারা যান রামমোহনের মৃত্যুর অনেক পরে।

রাধাপ্রসাদের দুই কন্যা : চন্দ্রজ্যোতি ও মৈত্রেয়ী। রাধাপ্রসাদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না।

রমাপ্রসাদের দুই পুত্র : হরিমোহন ও প্যারিমোহন। রমাপ্রসাদের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম দ্রবময়ী। ইনিই রমাপ্রসাদের দুই পুত্রের জননী।

হরিমোহন ও প্যারিমোহন নিঃসন্তান ছিলেন।

রামমোহনের বাণী

যেমন বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা দেখি গাভীগুলি নানা বর্ণের, কিন্তু তাদের প্রদত্ত দুধের রং একটিই—অর্থাৎ শ্বেত, তেমনি বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের আচরণগত নানা পার্থক্য দেখা গেলেও সকল ধর্মেরই অন্তর্নিহিত সত্য এক।

*

ভাব সেই একে
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাই যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।

*

পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

*

মানবসেবাই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।

*

সমগ্র পৃথিবীতে যে সংগ্রাম চলেছে তা কেবলমাত্র সংস্কারক ও সংস্কার-বিরোধীগণের মধ্যে নয়,—তা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ও স্বৈরাচারের মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, ন্যায়বিচার ও অবিচারের মধ্যে। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণমনা ও স্বৈরাচারীরা শেষপর্যন্ত সর্বদা ন্যায়নীতির সমর্থকগণের নিকট পরাজিত হয়েছে।

*

স্বাধীনতার যারা শত্রু, স্বৈরাচারের যারা পৃষ্ঠপোষক, তারা অতীতে কদাচ শেষপর্যন্ত সাফল্য লাভ করেনি, ভবিষ্যতেও কোনও দিন করবে না।

*

একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের দ্বারাই নয়, মানুষের নিরপেক্ষ সহজ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাও বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে—সমগ্র মানবজাতি একটি বিশাল পরিবার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এই মহাপরিবারের এক একটি শাখা মাত্র।

*

আমাদের মধ্যে যে ঐক্যের অভাব তার মূলে আছে আমাদের জাতিভেদ প্রথা।

*

সত্য ও প্রকৃত ধর্ম সব সময়ে বিত্ত, ক্ষমতা, নাম ও পদগৌরবের উপর নির্ভর করে না!

*

সারা বিশ্বের লোকেরা জানে যে হিন্দুদের মত এমন পরমতসহিষ্ণু জাতি পৃথিবীতে কোথাও নেই।

*

যদি কোন সম্প্রদায় দেশের কোন মতবাদকে পরিবর্তন করে নতুন কোন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে তাদের সেই মতবাদের যথার্থতা বা অন্ততপক্ষে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

*

ফ্রি প্রেস বা স্বাধীন সংবাদপত্র পৃথিবীর কোন স্থানেই বিপ্লবের সৃষ্টি করেনি।…যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই এবং যার ফলে অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় নি এবং তাদের প্রতিকারও সম্ভব হয়নি সেখানেই দেখা দিয়েছে অসংখ্য বিদ্রোহ।

আমাদিগর উচিত যে শাস্ত্র ও বুদ্ধি উভয়ের নির্ধারিত পথের সর্বথা চেষ্টা করি এবং ইহা অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।

ঘটনাপঞ্জী

১৭৭২	রামমোহনের জন্ম, ২২ মে। (মতান্তরে ১৭৭৪)
১৭৯৬	রামমোহনের পিতা রামকান্ত তাঁর বিষয় সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।
১৮০০	পুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম।
১৮০১	জন ডিগ্‌বী সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।
১৮০৩	পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু।
১৮০৩-৪	তুহ্‌ফাৎ-উল্‌ মুয়াহহিদীন গ্রন্থ প্রকাশ।
১৮০৫-১৪	চাকরি-জীবন : রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর ও রংপুরে সরকারী কর্ম।
১৮০৯	ভাগলপুরের কলেকটরের আচরণের বিরুদ্ধে লর্ড মিণ্টোর কাছে প্রতিবাদ।
১৮১২	পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম।
১৮১৫	কলকাতায় স্থায়ী বাস আরম্ভ। কর্মবহুল জীবনের সূত্রপাত।
১৮১৫	আত্মীয়সভা স্থাপন।
১৮১৫	'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশ।
১৮২১	ইউনিটেরিয়ান কমিটি স্থাপন।
১৮২১	'ব্রাহ্মণ সেবধি-ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন' প্রকাশ।
১৮২১	'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ।
১৮২২	মাতা তারিণী দেবীর মৃত্যু (পুরীতে)।
১৮২২	অ্যাংলো হিন্দু স্কুল স্থাপন (মাণিকতলা)।
১৮২২	ফার্সী পত্রিকা মীরাৎ-উল-আখ্‌বার প্রকাশ।

১৮২৩	'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' স্থাপন।
১৮২৩	সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আবেদনপত্র প্রেরণ।
১৮২৩	পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য লর্ড আমহার্ষ্টকে চিঠি।
১৮২৪	স্ত্রী শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু।
১৮২৬	বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮২৮	ব্রহ্মসভা স্থাপন (প্রথম অধিবেশন ২০ আগষ্ট)।
১৮২৯	সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ (৪ঠা ডিসেম্বর)।
১৮৩০	ব্রহ্ম সমাজের ট্রাস্ট ডীড্ সম্পন্ন।
১৮৩০	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন।
১৮৩০	জোড়াসাঁকোয় ব্রহ্ম সমাজের নতুন বাড়িতে উপাসনা আরম্ভ (২৩শে জানুয়ারী)।
১৮৩০	ডাফ্ সাহেবকে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য।
১৮৩০	ইংলণ্ড যাত্রা। (১৫ই নভেম্বর)
১৮৩১	বিলাতে পদার্পণ (৮ই এপ্রিল)।
১৮৩১	ইংলণ্ডের রাজার সহিত সাক্ষাৎ।
১৮৩২	রিফর্ম বিল পাশ।
১৮৩২	প্যারিসে গমন (সেপ্টম্বর)।
১৮৩২	প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ।
১৮৩৩	বৃস্টলে মহাপ্রয়াণ (২৭শে সেপ্টেম্বর)।
১৮৩৩	স্টেপলটন গ্রোভে সমাধি (১৮ই অক্টোবর)।

ব্রিস্টল নগরে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি

Beneath this stone

Rest the remains of Raja Rammohun Roy Bahadur a conscientious and steadfast believer in the unity of the godhead;

He consecrated his life with entire devotion to the worship of the divine spirit alone.

To great natural talents he united a thorough mastery of many languages, and early distinguished himself as one of the greatest scholars of his day.

His unwearied labours to promote the social, moral and physical condition of the people of India, his earnest endeavours to suppress idolatry and the rite of Suttee, and his constant zealous advocacy of whatever tended to advance the glory of God and the welfare of man, live in the grateful remembrance of his countrymen.

This tablet records the sorrow and pride with which his memory is cherished by his descendants.

He was born in Radhanagore, in Bengal in 1774 and died at Bristol, September 27th, 1833.

পরিশিষ্ট

লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের ঐতিহাসিক চিঠি

To

His Excellency the Right Hon'ble,

William Pitt, Lord Amherst

My Lord,

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present Rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs, and ideas are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances, as the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves, and afford our Rulers just ground of complaint at our apathy, did we omit on occasions of importance like the present to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.

The establishment of a new Sanscrit School in

Calcutta evinces the laudable desire of the Government to improve the Natives of India by Education, —a blessing for which they must ever be grateful; and every well-wisher of the human race must be desirous that the efforts made to promote it should be guided by the most enlightened principles, so that the stream of intelligence may flow into the most useful channels.

When this Seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful Sciences, which the Nations of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.

While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude; we have already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlightened of the Nations of the West with the glorious ambitions of planting in Asia the Arts and Sciences of modern Europe.

We now find that the Government are establishing a Sanscrit School under Hindoo Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This Seminary (similar in character to those which

existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago, with the addition of vain and empty subtleties since produced by speculative men, such as is already commonly taught in all parts of India.

The Sanscrit language, so difficult that almost a life time is necessary for its perfect acquisition, is well known to have been for ages a lamentable check on the diffusion of knowledge; and the learning concealed under this almost impervious veil is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of the valuable information it contains, this might be much more easily accomplished by other means than the establishment of a new Sanscrit College; for there have been always and are now numerous professors of Sanscrit in the different parts of the country, engaged in teaching this language as well as the other branches of literature which are to be the object of the new Seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to those most eminent Professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertions.

From these considerations, as the sum set apart

for the instruction of the Natives of India was intended by the Government in England, for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation, that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed; since no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable periods of their lives in acquiring the niceties of the Byakurun or Sanskrit Grammar. For instance, in learning to discuss such points as the following: *Khad* signifying to eat, *Khaduti*, he or she or it eats. Query, whether does the word *Khaduti*, taken as a whole, convey the meaning *he, she* or *it eats* or are separate parts of this meaning conveyed by distinct portions of the word? As if in the English language it were asked, how much meaning is there in the *eat*, how much in the *s*? And is the whole meaning of the word conveyed by those two portions of it distinctly, or by them taken jointly?

Neither can much improvement arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedant:—in what manner is the soul absorbed into the deity? What relation does it bear to the divine essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence; that as father, brother, etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better.

Again, no essential benefit can be derived by the

student of the *Meemangsa* from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Veds, and what is the real nature and operative influence of the passages of the Ved, etc.

Again the student of the Nyaya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it in how many ideal classes the objects in the Universe are divided and what speculative relation, the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, etc.

In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterized, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon, with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry and Anatomy, with other useful Sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents

and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus.

In representing this subject to your Lordship I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen and also to that enlightened Sovereign and Legislature which have extended their benevolent cares to this distant land actuated by a desire to improve its inhabitants and I therefore humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship.

I have, etc.,
RAMMOHUN ROY

Calcutta :
The 11th December, 1823.